বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

অনুসন্ধানী পাঠ

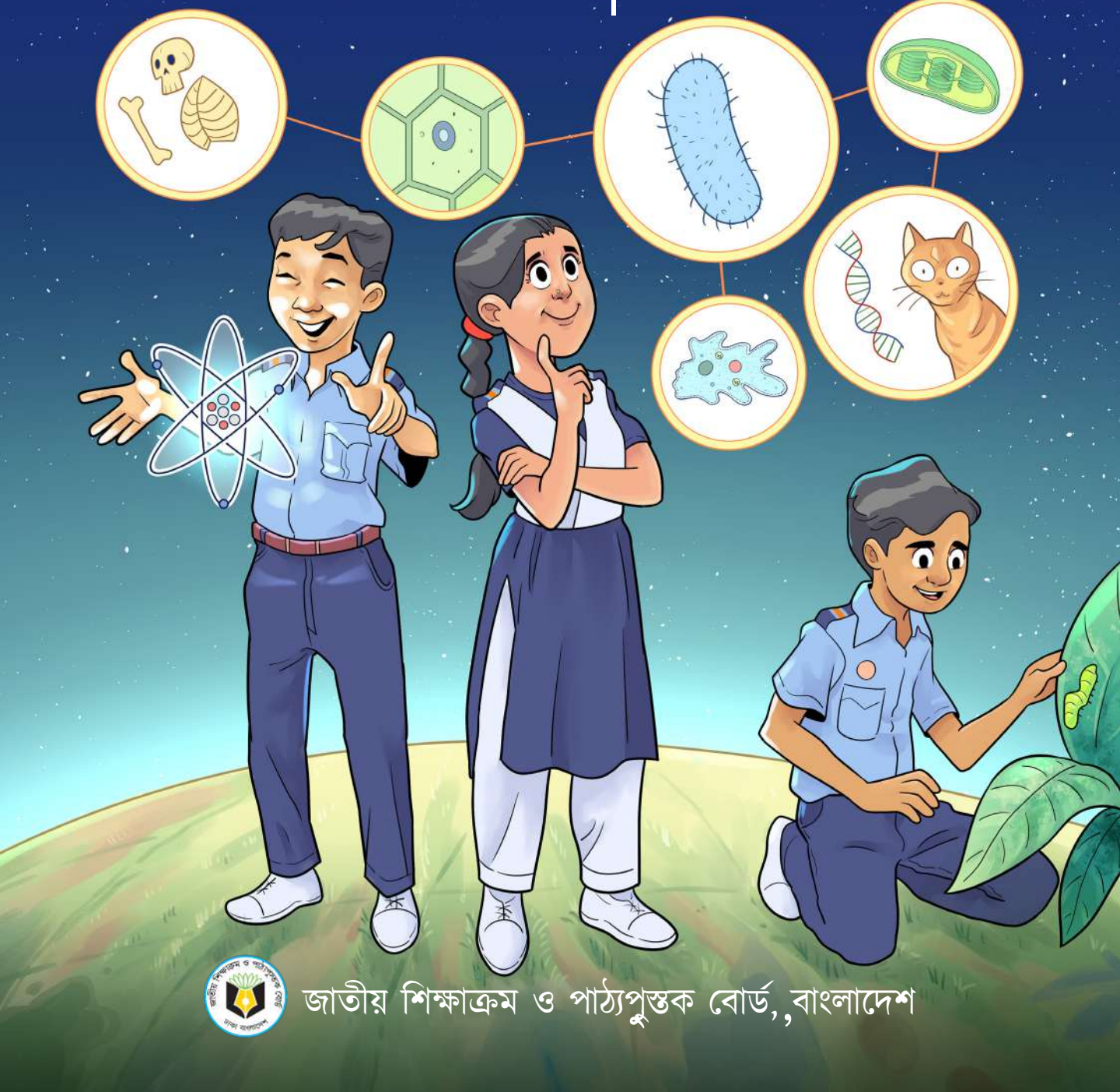

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার

● বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো আর্বজনা সংগ্রহ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনর্ব্যবহার ও নিষ্কাশনের সমন্বিত প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ থ্রি-আর (3R-Reduce, Reuse, Recycling) কৌশলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদন করে থাকে।

● বাংলাদেশে সাভারে প্রথম সিঙ্গাপুরের একটি কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা হয়। চামড়াশিল্প থেকে ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আইন করে ২০২১ সালের মধ্যে সকল শিল্প-কারখানার সঙ্গে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

● পরিবেশ-প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, জলজ প্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং বনজসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বিজ্ঞান | অনুসন্ধানী পাঠ

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. হাসিনা খান
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান
ড. মুশতাক ইবনে আয়ূব
রনি বসাক

সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমেদ
নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রণ
সব্যসাচী চাকমা

প্রচ্ছদ
মেহেদী হক
সব্যসাচী চাকমা

গ্রাফিক্স ডিজাইন
নাসরীন সুলতানা মিতু
মোঃ মেহেদী হোসেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১: জীববৈচিত্র্য ০১

অধ্যায় ২: অণু পরমাণু ১১

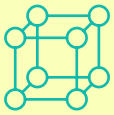

অধ্যায় ৩: পদার্থের গঠন ২২

অধ্যায় ৪: কোষবিজ্ঞান ৩১

অধ্যায় ৫: অণুজীবজগৎ ৪১

অধ্যায় ৬: তাপ ও তাপমাত্রা ৫৪

অধ্যায় ৭: আমাদের চারপাশের পরিবর্তন ৬৩

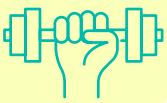

অধ্যায় ৮: কাজ, শক্তি, ক্ষমতা ৭৬

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৯: ভূ-প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত দুর্যোগ ও প্রতিকার ৮৪

অধ্যায় ১০: ভূ-পৃষ্ঠ ও প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব ৯৩

অধ্যায় ১১: ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ ১০২

অধ্যায় ১২: জীবে শক্তির প্রবাহ ১০৯

অধ্যায় ১৩: কঙ্কাল ও পরিপাকতন্ত্র ১১৯

অধ্যায় ১৪: বিভিন্ন ধরনের শিলা ১২৯

অধ্যায় ১৫: পৃথিবী ও মহাবিশ্ব ১৩৫

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা-

শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই? সপ্তম শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের স্বাগতম!

দেখতেই পাচ্ছ, এতদিন তোমরা যেভাবে পড়াশোনা করে এসেছ তাতে একটা বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে! তোমাদের সকল বিষয়ের বইগুলোও তাই এবার একটু অন্যরকম। বিজ্ঞান বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দুইটি বই হাতে পেয়েছ! এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বইটির সঙ্গে তোমাদের আরেকটা 'অনুশীলন বই'ও দেওয়া হয়েছে। একটু চোখ বুলালেই বুঝতে পারবে যে, এই বইটির সঙ্গে অনুশীলন বইটির বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সত্যি বলতে এতদিন যেভাবে তোমরা পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে বিজ্ঞান শিখতে চেষ্টা করেছ, এবার এই শেখার ধরনটাই একেবারে বদলে যাচ্ছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, নতুন নতুন কিছু সমস্যার সমাধান করবে। এই নতুন অভিজ্ঞতাগুলো আর সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো সব বিস্তারিতভাবে তোমাদের অনুশীলন বইটিতে দেওয়া আছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়ে নানা ধাপে তোমাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জানার প্রয়োজন পড়বে, সেজন্য তোমাদের সাহায্য করবে এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বই। স্কুলে বা বাড়িতে, যখন যেখানেই থাকো, তোমরা এই বইটির সাহায্য নিয়ে দরকার হলে নিজে নিজেই সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবে!

সপ্তম শ্রেণিতে তোমাদের বিজ্ঞানের যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হবে সেগুলো এই বইয়ে মোট পনেরোটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। পুরো বছরজুড়ে তোমরা যে অভিজ্ঞতাগুলোর ভেতর দিয়ে যাবে, তাতে এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে তোমাদের কাজে আসবে।

তাহলে শুরু করা যাক, কী বলো?

অধ্যায় ১

জীববৈচিত্র্য

অধ্যায় ১ জীববৈচিত্র্য

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ জীববৈচিত্র্য কী
- ☑ জীববৈচিত্র্যের উদ্ভব
- ☑ জীববৈচিত্র্যের স্বরূপ
- ☑ জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক
- ☑ জীববৈচিত্র্য পরিমাপের উপায়
- ☑ বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য
- ☑ জীববৈচিত্র্যের ঝুঁকি ও প্রতিকার

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই পৃথিবী কেন সুন্দর? তবে নানান উত্তর আসতে পারে। কিন্তু যদি আমাদের জানা অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে তুলনা করি, তবে বুঝতে পারব পৃথিবীর এই সৌন্দর্যের পেছনে নিশ্চিত করেই ভূমিকা রাখছে এর বিচিত্র জীবজগৎ। মঙ্গলগ্রহ, বৃহস্পতি কিংবা চাঁদ এসব গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলোর কথাই আমরা বলি না কেন, সেগুলোর রুক্ষ প্রাণহীন একটি পরিবেশ। তার তুলনায় পৃথিবীর এই সজীব, প্রাণময় পরিবেশ আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অনুভূতি তৈরি করে।

মানুষসহ এই পৃথিবীতে নানান বৈশিষ্ট্যের কোটি কোটি জীব আছে। সেগুলোর আকার, আকৃতি, রং, বাসস্থান, খাদ্য ইত্যাদি সবকছুতেই রয়েছে বৈচিত্র্য। বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক্ষেত্র হচ্ছে জীবের এই বৈচিত্র সম্পর্কে জানা। কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে টিকে থাকে, সেগুলোর প্রজনন বা সংখ্যাবৃদ্ধি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলোর পুষ্টি বা খাদ্যের বিষয়টি কীভাবে তারা নিশ্চিত করে, বিজ্ঞানীরা এর সবকিছু জানতে চান। তীব্র ঠান্ডা মেরু অঞ্চলে, উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে কিংবা সূর্যের আলোর নিশানাহীন সমুদ্রের গভীর তলদেশের পরিবেশে যেভাবে খাপ খাইয়ে নানান ধরনের জীব বেঁচে থাকছে, তা এক অপার বিস্ময়ের বিষয়।

আমরা এই অধ্যায়ে এই বিস্ময়কর জীববৈচিত্র্য নিয়ে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করব। উপরের শ্রেণিতে ধীরে ধীরে আরো বিস্তারিতভাবে তোমরা এসব বিষয় জানতে পারবে।

জীববৈচিত্র্য কী?

জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity শব্দ দ্বারা পৃথিবীতে জীবনের বিপুল বৈচিত্র্য বর্ণনা করা হয়। জীববৈচিত্র্য বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীবসহ সকল জীবের মধ্যে বিদ্যমান বৈচিত্র্যকে বুঝায়। পৃথিবীতে ঠিক কত সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জীব আছে তা নিশ্চিত করে এখানো আমাদের জানা নেই। তবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে, প্রায় ৮-১৪ মিলিয়ন (৮০ থেকে ১৪০ লক্ষ) বিভিন্ন প্রজাতির জীব এই পৃথিবীতে রয়েছে। কারো কারো ধারণা মতে সংখ্যাটা আরো বেশি। তবে সংখ্যা যাই হোক না কেন, এসব জীবের বেশিরভাগই আমাদের অজানা। এখন পর্যন্ত মাত্র ১.২ মিলিয়ন (১২ লক্ষ) প্রজাতি শনাক্ত এবং বর্ণনা করা হয়েছে, যার অধিকাংশই অবশ্য পোকামাকড়। এর অর্থ দাড়ায় এই যে, কোটি কোটি অন্যান্য জীব এখনো আমাদের কাছে রহস্যময়, অজানা।

জীববৈচিত্র্যের উদ্ভব

বর্তমানে জীবিত সকল প্রজাতির অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হাজার হাজার বছরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিকশিত হয়েছে। একটি জীব তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য যেসব কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে বলা হয় অভিযোজন (Adaptation)। অপরদিকে নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই জীবের এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে যাবার সময় কিছু পরিবর্তন ঘটে। যে কারণে আমরা দেখতে হুবহু আমাদের মা বাবার মতো না হয়ে একটু হলেও আলাদা হই! যমজ না হলে ভাইবোনদের চেহারাও হুবহু একই হয় না, যদিও তারা একই বাবা মায়ের সন্তান! মা বাবা থেকে সন্তান—এই এক প্রজন্মে চেহারার এই পার্থক্য খুব ছোট পরিবর্তন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই ছোট পরিবর্তনগুলো ঘটতে ঘটতে এক পর্যায়ে এমন বৈশিষ্ট্যের নতুন জীব দেখা দেয় যা সেগুলোর আদি পূর্বপুরুষ থেকে অনেক আলাদা। এইভাবে দীর্ঘ সময় ধরে জীবের মধ্যে পরিবর্তন ঘটার যে প্রক্রিয়া, তাকে বলা হয় বিবর্তন। বিবর্তন এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যই জীবজগতের সদস্যদের একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা করে তুলেছে। যেকোনো প্রাণী তার জীবদ্দশায় নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রজতিকে বাঁচিয়ে রাখে। যা আমরা প্রজনন

হিসেবে জানি। যে জীবগুলো সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত ও অভিযোজিত হয়ে হয়ে একে অপরের থেকে এতটাই আলাদা হয়ে গেছে যে, যে সেগুলো আর একে অপরের সঙ্গে প্রজননে অংশ নিতে পারে না, সেগুলোর আলাদা প্রজাতি (Species) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেসব জীব একে অপরের সাথে প্রজনন করতে পারে, সেগুলোকে সাধারণত একই প্রজাতির ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জীববৈচিত্র্যের স্বরূপ

বিশ্বজুড়ে কতটা জীববৈচিত্র্য রয়েছে তা নিয়ে জানতে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ সীমাহীন, কারণ, এখনও সেগুলোর অনেক জীববৈচিত্র্য আবিষ্কার করা বাকি আছে। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জীব ওই অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী অভিযোজিত হয়। অঞ্চলভিত্তিক এই জীবগোষ্ঠী এবং তার পরিবেশের জড় উপাদান মিলে যে সিস্টেম তৈরি হয়, তাকে বলা হয় ইকোসিস্টেম (Ecosystem) বা বাস্তুতন্ত্র। এই বাস্তুতন্ত্র কে "বায়োম"ও (Biome) বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। যেমন- সবুজ বনভূমিতে, বরফে ঢাকা তুন্দ্রা অঞ্চলে, কিংবা পুকুর, হ্রদ বা সাগরের পানির নিচে বাস্তুতন্ত্রের ধরন একে অপরের চেয়ে অনেক আলাদা। যেসব প্রজাতির বৈশিষ্ট্য কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে বেশি উপযোগী সেগুলো সেখানে টিকে থাকে এবং সফলভাবে বংশবৃদ্ধি করে।

সহজভাবে বলা যায়, বায়োম হলো একটি বিশাল এলাকা যা এই এলাকার গাছপালা, মাটি, জলবায়ু এবং বন্যপ্রাণী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। পাঁচটি প্রধান ধরনের বায়োম রয়েছে: জলজ, তৃণভূমি, বন, মরুভূমি এবং তুন্দ্রা, যদিও এই বায়োমগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে আরও নির্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমন মিষ্টি জল, সামুদ্রিক, ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল (Rainforest) যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা নাতিশীতোষ্ণ হয়ে থাকে এবং জলাভূমিময় পাইনগাছের বন বা তাইগা।

একটি পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে সেখানে মাছ, ব্যাঙ, মাছরাঙা, ফড়িং এবং আরও নানা রকম পোকামাকড় দেখতে পাবে। তৃণভূমিতে ইঁদুর, সাপ, কেঁচো ইত্যাদি প্রজাতি থাকতে পারে, আর নানা ধরনের পোকা-মাকড় তো থাকবেই। আবার বাংলাদেশের একটি তৃণভূমির সঙ্গে কানাডার একটি তৃনভূমি তুলনা করলে দেখেবে সেগুলোর জীববৈচিত্র ভিন্ন। সবচেয়ে বেশি জীববৈচিত্র্য ধারণ করা বাস্তুতন্ত্রগুলোতে সেখানকার প্রাণী, উদ্ভিদ, অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আদর্শ পরিবেশগত অবস্থা থাকে।

বিশ্বের কিছু অঞ্চল, যেমন মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, দক্ষিণ-পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মাদাগাস্কারের অঞ্চলে অন্যদের চেয়ে বেশি জীববৈচিত্র্য রয়েছে। বিশ্বের এসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় প্রজাতি রয়েছে। স্থানীয় প্রজাতি হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো শুধু কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বিদ্যমান। যেমন- দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ ফ্লোরিস্টিক (Cape Floristic) অঞ্চলে প্রায় ৬২০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে, যা বিশ্বের আর কোথাও পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রজাতির উচ্চ সংখ্যার অঞ্চলগুলোকে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট (Hotspot) বলা হয়।

জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক

পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি বেঁচে থাকার জন্য এবং সেগুলোর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একসঙ্গে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, চারণভূমির ঘাস গবাদি পশু খায়। গবাদি পশু যে মল ত্যাগ করে, তা সার তৈরি করে যা মাটিতে পুষ্টি ফেরত দেয়, যা আরও ঘাস জন্মাতে সাহায্য করে। এই সার ফসলি জমিতে প্রয়োগ করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক প্রজাতি খাদ্য, পোশাক এবং ওষুধ সহ নানা উপকরণ প্রদান করে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জীববৈচিত্র্য পরিমাপের উপায়

জীববৈচিত্র্য পরিমাপের একটি সাধারণ উপায় হলো একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বসবাসকারী প্রজাতির মোট সংখ্যা গণনা করা। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল, যেখানে সারা বছর উষ্ণ থাকে, সেখানে সবচেয়ে বেশি জীববৈচিত্র্য রয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, যেখানে উষ্ণ গ্রীষ্ম এবং ঠান্ডা শীত থাকে, সেখানে জীববৈচিত্র্য কম থাকে। পাহাড়ের চূড়া এবং মরুভূমির মতো শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে জীববৈচিত্র্য আরও কম।

সাধারণত, বিষুবরেখার যত কাছে একটি অঞ্চল, জীববৈচিত্র্য তত বেশি। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন রেইন ফরেস্ট অন্তত ৪০,০০০ বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রজাতি বাস করে। এটি আমাদের এই পৃথিবী নামের গ্রহের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের উষ্ণ জলে নানা প্রজাতির মাছ, প্রবাল ইত্যাদির সমাহারে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক পরিবেশ রয়েছে। অনেক প্রবাল মিলে প্রবাল প্রাচীর তৈরি করে, যেগুলো আরও শত শত প্রজাতির জীবের বাসস্থান। এসব প্রবাল প্রাচীরে ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শৈবাল থেকে থেকে শুরু করে বড় হাঙর পর্যন্ত বাস করে।

জীববৈচিত্র্য পরিমাপের আরেকটি উপায় হলো জেনেটিক বৈচিত্র্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরো একটু বিস্তৃত ভাবে জানব, তবে এখন জেনে রাখি যে জীবকোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে এই জিন। তুমি দুপেয়ে মানুষ নাকি চারপেয়ে বিড়াল, তোমার চুল কোঁকড়া নাকি সোজা—এই সকল তথ্যই জমা থাকে তোমার কোষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোনো না কোনো জিনে। কিছু প্রজাতির প্রায় ৪০০,০০০ (চার লক্ষ) জিন আছে। মানুষের জিনের সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)। এই জিনগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আছে যেগুলো একটি প্রজাতির সমস্ত সদস্যের জন্য একইরকম। এসব জিনই একটি গোলাপকে গোলাপ এবং একটি কুকুরকে কুকুর হিসেবে নির্ধারণ করে। কিন্তু একটি প্রজাতির জিনগুলোর মধ্যে কিছু কিছু জিন থাকে ভিন্ন। এই জেনেটিক পরিবর্তনের কারণেই কিছু গোলাপ হয় গোলাপি রঙের, আর কিছু হয় সাদা। আবার মানুষের ক্ষেত্রে বলা যায়, জিনের এরকম পার্থক্যের কারণেই কিছু লোকের চোখ বাদামি এবং কিছু লোকের চোখ নীল।

প্রজাতির বৃহত্তর জেনেটিক বৈচিত্র্য গাছপালা এবং প্রাণীদের রোগ প্রতিরোধী করে তুলতে পারে। জেনেটিক বৈচিত্র্য প্রজাতিগুলোকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে আরও ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে দেয়।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য

সিন্ধু-গঙ্গা সমতল ভূমির অংশ হিসেবে জীববৈচিত্র্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সবুজে শ্যামলে ঘেরা এমনই একটি দেশ যেখানে মাটি, পানি, বন বনানী, প্রাকৃতিক পরিবেশ নানা ধরনের জীবের জীবনধারণের জন্য উপযোগী। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও জলবায়ু, উর্বর মাটি, বিষুবরেখার কাছাকাছি অবস্থানের কারণে পর্যাপ্ত সূর্যালোক, অধিক বৃষ্টিপাত আর সবুজ প্রকৃতি এদেশে নানা ধরনের প্রাণী ও জীবজগতের অভয়ারণ্যের মূল কারণ। সুন্দরবনের সুবিশাল জীব সম্প্রদায় এবং কক্সবাজার এবং সেন্টমার্টিনের সমুদ্রগর্ভের জলজ প্রাণী সবই এদেশের জীবসম্পদ।

সিন্ধু-গঙ্গা সমতল ভূমি

সিন্ধু-গঙ্গা সমতল ভূমি হলো একটি বিরাট উর্বর সমভূমি অঞ্চল যা পাকিস্তানের একটি অংশ, উত্তর ও পূর্ব ভারতের অধিকাংশ এবং প্রায় সম্পূর্ণ বাংলাদেশ জুড়ে অবস্থিত। অঞ্চলটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সিন্ধু নদ ও গঙ্গা নদীর নামে এই অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সপুষ্পক উদ্ভিদ, মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলগুলোর অবস্থানগত কারণে জীববৈচিত্র্যময় সম্পদে ভরপুর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বনাঞ্চলগুলোতে ৫০০০ এর অধিক সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতি পাওয়া যায়। কেবল চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে প্রায় ২,২৬০ টি উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। এসব উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ, আঁশ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ এবং ঔষধি উদ্ভিদ।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১৩২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫৭৮ প্রজাতির পাখি, ১৫৪ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৯ প্রজাতির উভচর জীব শনাক্ত করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের ঝুঁকি ও প্রতিকার

পৃথিবীর বেশিরভাগ জীববৈচিত্র্য মানুষের ব্যবহার এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, যা বাস্তুতন্ত্রকে বিশৃঙ্খল করে, এমনকি কখনো কখনো বিনষ্টও করে ফেলে। দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবই জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি। এই হুমকি প্রজাতি বিলুপ্তির পেছনে মূল ভূমিকা রাখছে। কিছু বিজ্ঞানী অনুমান করেছেন যে, আগামী শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতির অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হলেও এখানেও নানান প্রজাতি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (IUCN) এর তথ্য মতে, বাংলাদেশের ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। এছাড়াও এ দেশের প্রায় ২৯টি বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন। মূলত নগরায়ন, খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান, ওষুধ ও পরিধেয় বস্ত্রের উপাদান জোগাড় করার কারণে ধ্বংস করা হচ্ছে জীবের নিরাপদ আবাসস্থল।

মানব জাতি সকল প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন, জলাশয়, সমুদ্র, বনাঞ্চল উজাড় করছে সেগুলোর নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে। সুন্দরবন এবং মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়সহ বিভিন্ন বনভূমিতে বিদ্যমান প্রাণী ও জীবজন্তু, যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, সরীসৃপ, অজগর, বুনো হাঁস, কালো হাঁস, নীল গাই, রাজশকুন, বুনো মহিষ, মিঠা পানির কুমির, ঘড়িয়াল আজ প্রায় বিলুপ্ত হতে হতে চরম হুমকির মধ্যে জীবনধারণ করছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৯ প্রজাতির প্রাণী হুমকির সম্মুখীন। বনবিজ্ঞানীগণের মতে, বাংলাদেশে ১২৫টির মতো বৃক্ষ প্রজাতি বিপন্ন প্রায়।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং একই বিপন্ন প্রজাতি এবং সেগুলোর আবাসস্থল রক্ষা করার জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এখন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পরিবেশ দূষণ, বন্যপ্রাণী হত্যা করে সেগুলোর চামড়া বা হাড় দিয়ে পণ্য তৈরি, প্রাণী পাচার ইত্যাদি সমস্যার কারণে

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যপকভাবে অনুভূত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং দেশের বাইরের খ্যাতিমান সংস্থা, জাতিসংঘসহ নানা প্রতিষ্ঠান এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলকে সেখানকার অধিবাসী উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর নিরাপদ অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে জীববৈচিত্র্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনে মানুষের গতিবিধি সীমিত রাখা হয়। বাংলাদেশেও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সরকার দেশের বনাঞ্চলের কিছু অংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের গাছ আহরণ বন্ধ রাখা ছাড়াও মানুষ সৃষ্ট বনায়নের পুরাতন গাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্যপ্রাণী নিধন ও পাচার রোধে নতুন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। এরকম সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেকে দেশেই জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো এসব পদক্ষেপকে আরো জোরালো করতে বলেন। শুধু সরকারি উদ্যোগ এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, বরং সেই সঙ্গে প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা। সময়ের সঙ্গে যেসব জীব ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলোর হয়তো ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু সবাই যত্নশীল হলে বর্তমান পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য রক্ষা হয়তো সম্ভব হবে। সেদিকে সবারই মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাহলেই হয়তো সুন্দর পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আবার সমৃদ্ধ ও বর্ণিল হয়ে উঠবে।

অনুশীলনী ?

১। বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে জীব বৈচিত্র্য বেশি কেন?

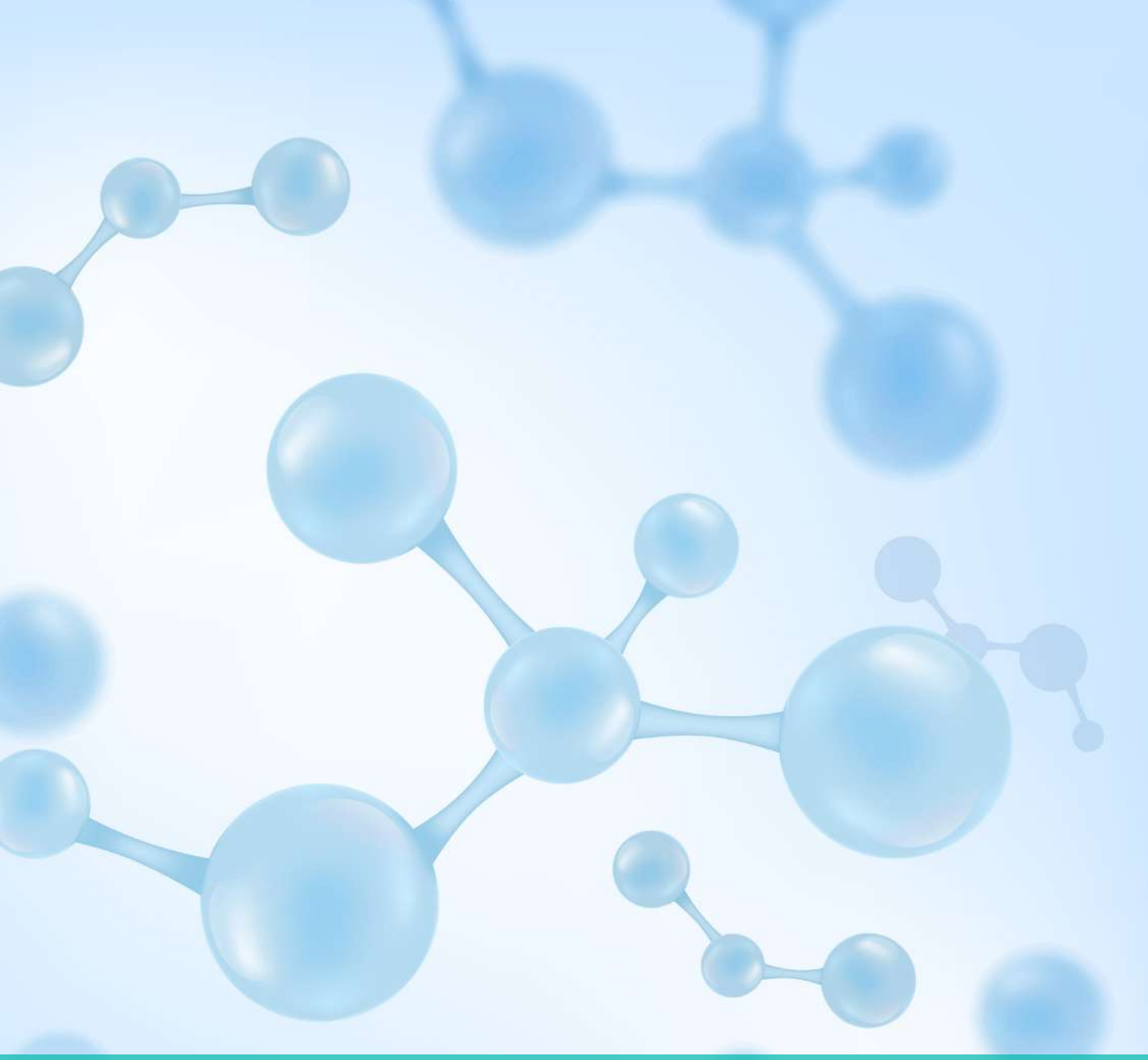

অধ্যায় ২

অণু পরমাণু

অধ্যায় ২ অণু পরমাণু

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ পরমাণু ও অণু
- ☑ মৌলিক পদার্থ
- ☑ ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন
- ☑ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস
- ☑ নিউক্লিয়াস
- ☑ পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী পদার্থ
- ☑ কঠিন তরল ও গ্যাস

পরমাণু

মৌলিক পদার্থ

আমাদের চারপাশে কত রকম পদার্থ—মেঘ-সমুদ্র, মাটি-পাথর, ঘরবাড়ি, মানুষজন, গাছপালা, খাল-নদী, পশুপাখি, যন্ত্রপাতি; আমরা আসলে কখনোই সব কিছু বলে শেষ করতে পারব না। তোমরা নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে অবাক হয়ে ভেবেছ এই লক্ষ-কোটি ধরনের পদার্থ নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে লক্ষ-কোটি উপাদান দিয়ে।

কিন্তু তোমরা শুনে অবাক হয়ে যাবে যখন জানবে এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পদার্থ তৈরি হয়েছে মাত্র ৯৮ টি মৌলিক পদার্থ দিয়ে। যে পদার্থ ভাঙলে সেই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলে। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে কিংবা ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু ৯৮টির বাইরে যে ২০টি মৌলিক পদার্থ আছে সেগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছে এবং প্রকৃতিতে সেগুলোর পরিমাণে এত কম যে সেগুলো বিবেচনা করা না হলেও খুব ক্ষতি হবে না।

পাশের টেবিলে কিছু পরিচিত মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় অক্সিজেন গ্রহণ করি। লোহা খুবই পরিচিত একটি ধাতু। অ্যালুমিনিয়ামের

কয়েকটি পরিচিত মৌলিক পদার্থ

হাইড্রোজেন	Hydrogen
অক্সিজেন	Oxygen
লোহা	Iron
সোনা	Gold
রুপা	Silver
কার্বন	Carbon
ক্লোরিন	Chlorine
অ্যালুমিনিয়াম	Aluminium

বাসন-পত্র তোমরা সবাই দেখেছ। সোনা রুপা দিয়ে গয়না তৈরি করা হয়। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে পানি তৈরি হয়েছে, কাজেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ হলেও পানি মৌলিক পদার্থ নয়, এটি যৌগিক পদার্থ—যে সকল পদার্থকে ভাঙলে দুই বা দুইয়ের মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলোকে যৌগিক পদার্থ বলে। তোমরা পরের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন

তোমরা যারা যারা ভাবছ এই ৯৮টি মৌলিক পদার্থের তালিকাটা পেলেই এই পৃথিবীর সব কিছু কী দিয়ে তৈরি হয়েছে তুমি তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেয়ে যাবে সেগুলোর জন্য আরও সুসংবাদ আছে। এই মৌলিক পদার্থগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোর 'পরমাণু' দিয়ে এবং সেই পরমাণুগুলো তৈরি হয়েছে মাত্র তিনটি কণা দিয়ে, সেগুলোর নাম হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন।

কাজেই এটা মোটেও অতিরঞ্জন নয় যে তোমাদের চারপাশের পুরো পরিচিত জগৎ তৈরি হয়েছে মাত্র তিনটি মৌলিক কণা দিয়ে। সেজন্য এ পুরো বিশ্ব জগৎ কীভাবে তৈরি হয়েছে সেটা বুঝতে চাইলে সবার আগে জানতে হবে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে কীভাবে এই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলো তৈরি হয়।

পরমাণুর গঠন

ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরি মৌলিক পদার্থের সবচেয়ে ছোট একক হচ্ছে পরমাণু। পরমাণুগুলো এত ছোট যে তোমরা কখনই সেগুলো দেখতে পাও না, কিন্তু যদি দেখার উপায় থাকতো তাহলে দেখতে পরমাণুগুলোর মাঝখানে আছে প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরি খুবই ছোট একটি নিউক্লিয়াস এবং সেটিকে ঘিরে ঘুরছে ইলেকট্রন! এই যে এক লাইনে তোমাদেরকে পরমাণু গঠনের কথা বলে দেওয়া হলো তোমরা চিন্তাও করতে পারবেনা কত হাজার বছর ধরে কত শত বিজ্ঞানী কত গবেষণা করে এটা শেষ পর্যন্ত বের করতে পেরেছিলেন।

যখনই দেখা যায় কিছু একটা ঘুরছে তখনই বুঝে নিতে হবে কোনো একটা বল সেটিকে নিজের দিকে টানছে। সূর্য পৃথিবীকে টানছে বলে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবী চাঁদকে টানছে বলে চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। ঠিক সেরকম পরমাণুর মাঝখানে থাকা খুবই ছোট নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানছে বলে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরছে।

এখন প্রশ্ন হলো পরমাণুর ভেতরকার খুবই ছোট নিউক্লিয়াস কেন ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানছে? তার কারণ হচ্ছে, বৈদ্যুতিক আকর্ষণ। নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই সত্যি; কিন্তু

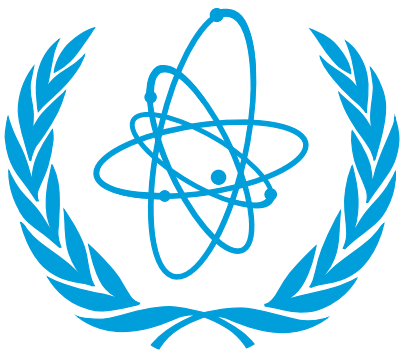

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির লোগোতে একটি পরমাণুর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, এরকম পরমাণুর ছবি সর্বত্র ব্যবহার করা হলেও সত্যিকারের পরমাণু দেখতে কিন্তু মোটেও এরকম নয়!

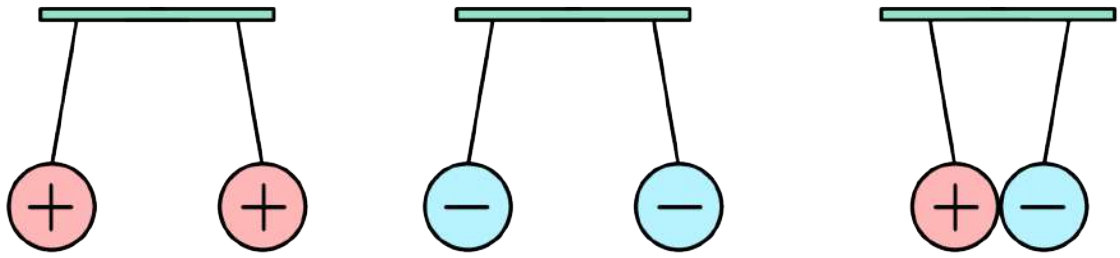

এক ধরনের চার্জ একে অন্যকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত চার্জ একে অপরকে আকর্ষণ করে

প্রোটনের চার্জ পজিটিভ, তাই নিউক্লিয়াসের মোট চার্জ সবসময় পজিটিভ। অন্যদিকে ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ এবং বৈদ্যুতিক বলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিপরীত চার্জ একে অপরকে আকর্ষণ করে (এবং এক ধরনের চার্জ একে অন্যকে বিকর্ষণ করে)। তাই নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে ইলেকট্রন তাকে ঘিরে ঘোরে। এই বৈদ্যুতিক বল এবং শক্তির কথা তোমরা পরে আরও পড়বে, আরও অনেক কিছু জানবে এবং অনেকভাবে ব্যবহার করবে। আপাতত জেনে রাখো একটা পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রনের নেগেটিভ এবং প্রোটনের পজিটিভ চার্জ দিয়েই সবকিছু শুরু।

বলা যেতে পারে, আমরা এখন পরমাণুর গঠনের মূল বিষয়টি জেনে গেছি। একটা পরমাণুর মাঝখানে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরি খুবই ছোট একটা নিউক্লিয়াস; যেখানে প্রোটনের চার্জ পজিটিভ এবং নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘোরে ইলেকট্রন। কারণ, ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ এবং নিউক্লিয়াসে পজিটিভ চার্জের প্রোটনগুলো ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

পারমাণবিক সংখ্যা: এই অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে। এই ১১৮ টি মৌলিক পদার্থের রয়েছে ১১৮টি ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু। পরমাণুগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী? কীভাবে সেগুলোকে আলাদা করা হয়?

আসলে সেই পদ্ধতিটি খুবই সহজ! তালিকার প্রথম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা প্রোটন, কাজেই বাইরে একটা ইলেকট্রন। তার নাম হাইড্রোজেন। এর পরের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের দুইটা প্রোটন (এবং দুইটা নিউট্রন) এবং বাইরে দুইটা ইলেকট্রন, তার নাম হিলিয়াম। এর পরের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে তিনটা প্রোটন (এবং তিনটা নিউট্রন) কাজেই তার বাইরে তিনটা ইলেকট্রন, তার নাম হচ্ছে লিথিয়াম। এভাবে নিউক্লিয়াসে একটা করে প্রোটন, বাইরে একটা করে ইলেকট্রন বেড়েছে এবং এখন পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ পরমাণু নিউক্লিয়াস ১১৮ টি প্রোটন এবং বাইরে ১১৮ টি ইলেকট্রন (এবং নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন তার সমান কিংবা বেশি নিউট্রন)। একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি প্রোটন থাকে, সেটিই হচ্ছে সেই পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ একটা পরমাণুতে যে কয়টি প্রোটন থাকে বাইরে ঠিক সেই কয়টি ইলেকট্রন থাকতে হয় কারণ প্রোটন আর ইলেকট্রনের চার্জ সমান, শুধু একটা পজিটিভ অন্যটা নেগেটিভ। কাজেই দুটোর সংখ্যা সমান সমান হলে পজিটিভ এবং নেগেটিভ মিলে মোট চার্জের পরিমাণ শূন্য কিংবা চার্জ বিহীন

হয়! তোমাদের মনে হতে পারে, নিউট্রনের যেহেতু চার্জ নেই; তাই তার সংখ্যা কম বেশি হলে কিছু আসে যায় না কিন্তু তারপরও নিউক্লিয়াসের ভেতরে যতগুলো প্রোটন তার সমান কিংবা বেশি নিউট্রন থাকতে হয়, তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, যেটি তোমরা একটু পরেই জানতে পারবে।

ইলেকট্রন বিন্যাস: আমরা বলেছি একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি প্রোটন থাকে বাইরে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা জানতে চাইব সেগুলো কীভাবে থাকে? সবগুলো ইলেকট্রন কি এক জায়গায় এলোমেলোভাবে থাকে নাকি সৌরজগতে একেকটি কক্ষপথে যেরকম একেকটি করে গ্রহ থাকে সেভাবে থাকে?

ইলেকট্রনগুলো আসলে মোটেও এলোমেলোভাবে থাকে না, সেগুলো নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকে। তবে এক কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন থাকে না, আরো বেশি সংখ্যক থাকে, এবং একটি কক্ষপথে কয়েকটি ইলেকট্রন থাকবে, সেটিও পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। শুধু তোমরা জেনে রাখো একটি ইলেকট্রন কোন কক্ষপথ আছে তার ওপর সেই ইলেকট্রনের শক্তি নির্ভর করে। কাজেই কক্ষপথগুলো শক্তির স্তর হিসেবে কল্পনা করা যায়। যেমন আমরা যদি একটা সোনার পরমাণুর কথা চিন্তা করি, তার ভেতরে কক্ষপথের ইলেকট্রন খুবই শক্তভাবে নিউক্লিয়াসে আকর্ষণে আবদ্ধ থাকে। তাই সেটিকে সরাতে হলে অনেক শক্তি দিতে হয়। আবার বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো খুবই দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকে—খুব সহজেই সেগুলোকে মুক্ত করে নেওয়া যায়! বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য মুক্ত ইলেকট্রনের দরকার হয়, সেজন্য সোনা খুবই ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী।

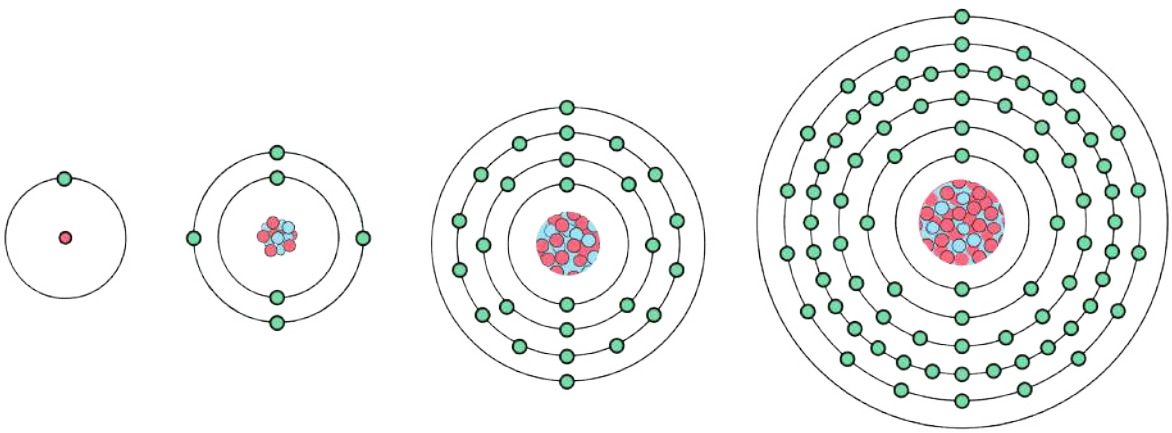

হাইড্রোজেন, কার্বন, লোহা এবং সোনার পরমাণুতে যথাক্রমে,
১, ৬, ২৬ এবং ৭৯টি ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসে সমান সংখ্যক প্রোটন রয়েছে।

কাজেই এখন তোমরা মোটামুটিভাবে দুটো বিষয় বলতে পারবে। একটা পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা যত বেশি হবে তার ইলেকট্রনগুলো সাজানোর জন্য বেশি কক্ষপথের প্রয়োজন হবে বলে তার আকার তত বড়। আবার একেবারে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো কীভাবে আছে, সেটাই তার ধর্মকে নির্ধারণ করে। সেজন্য কোনো কোনো পরমাণু হচ্ছে ধাতু, কোনোটি অধাতু, কোনোটি গ্যাস কোনোটি তরল কিংবা কঠিন, কোনোটি নিষ্ক্রিয় আবার কোনোটা অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল।

নিউক্লিয়াস

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে নিউক্লিয়াসের কথা বলার সময় প্রতিবার তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নিউক্লিয়াসটা খুবই ছোট। পরমাণুর তুলনায় সেটি কত ছোট শুনলে তোমরা নিঃসন্দেহে হতবাক হয়ে যাবে। একটা পরমাণুর ব্যাসার্ধ থেকে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ প্রায় লক্ষ গুণ ছোট কাজেই আয়তনের হিসেবে সেটি লক্ষ × লক্ষ × লক্ষ গুণ বেশি ছোট! বলতে পারো একটা পরমাণুর ভেতরে বলতে গেলে পুরোটাই ফাঁকা, পৃথিবীটাকে চাপ দিয়ে যদি এই ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করে ফেলা যেত তাহলে পুরো পৃথিবীটাকে একটা ফুটবল মাঠে রেখে দেওয়া যেত!

কাজেই নিউক্লিয়াসের ভেতর খুবই একটা ছোট জায়গায় প্রোটনগুলোকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়! কিন্তু তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে বৈদ্যুতিক বলের বেলায় বিপরীত চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করলেও একই চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কাজেই একটা নিউক্লিয়াসের ভেতর গাদাগাদি করে থাকা পজিটিভ চার্জের প্রোটনগুলো পরস্পরকে প্রচণ্ডবলে বিকর্ষণ করে। এই বিকর্ষণ কমানোর জন্য নিউক্লিয়াসে সবসময়ই প্রোটনের সমান সংখ্যক কিংবা আরো বেশি নিউট্রন থাকে। একটি নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে কয়টি ইলেকট্রন এবং কয়টি প্রোটন থাকে সেটি নির্দিষ্ট থাকলেও নিউট্রনের সংখ্যা কিন্তু একেবারে সুনির্দিষ্ট নয়, সেটি কম কিংবা বেশি হতে পারে। একই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন পাওয়া যেতে পারে, সেগুলোর একটিকে আরেকটির আইসোটপ বলে, উপরের ক্লাসে তোমরা সেগুলো আরো বিস্তৃতভাবে জানবে। শুধু একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কোনো নিউট্রন নেই। সেই নিউক্লিয়াসে বিকর্ষণ করার জন্য দ্বিতীয় প্রোটনও নেই, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সেটি হচ্ছে হাইড্রোজেনের পরমাণু।

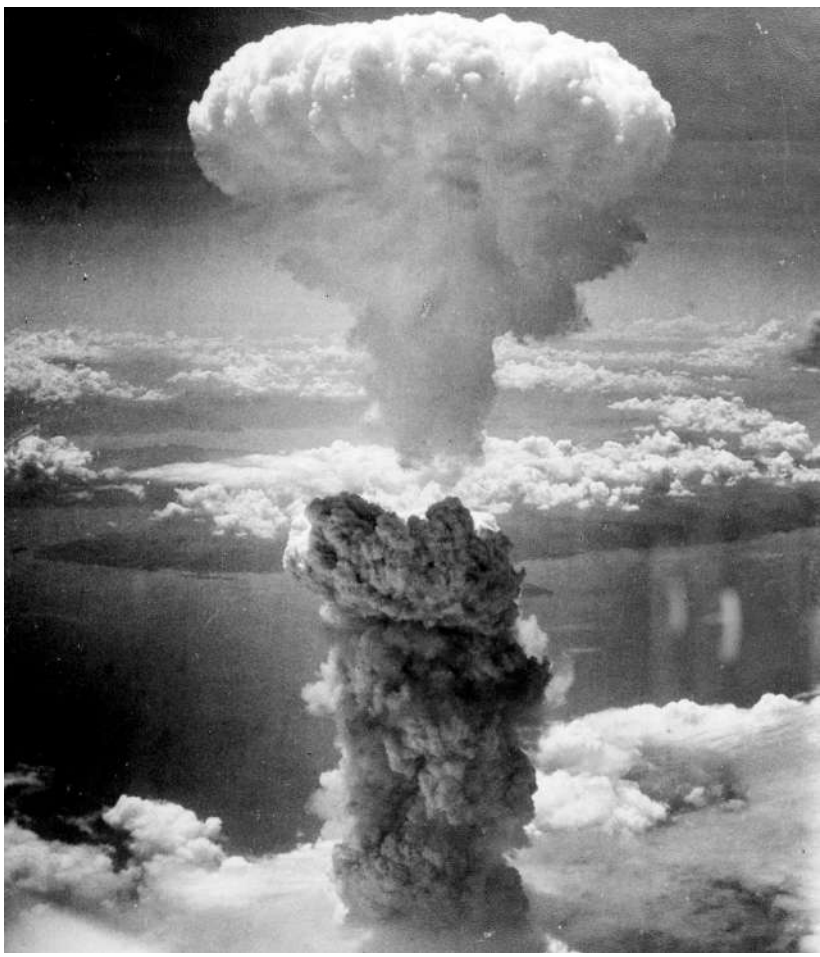

জাপানের হিরোশিমায় নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয়েছিল।

একটা নিউট্রনের ভর এবং প্রোটনের ভর খুবই কাছাকাছি এবং সেটি ইলেক্ট্রনের ভর থেকে দুই হাজার গুণ বেশি। অর্থাৎ ইলেকট্রন এত হালকা যে আসলে পরমাণুর ভর হচ্ছে তার নিউট্রন এবং প্রোটন কিংবা নিউক্লিয়াসের ভর।

তেজস্ক্রিয়তা: আমরা এই অধ্যায়ে শুরুতে বলেছি, যদিও এখন পর্যন্ত ১১৮টি পরমাণু পাওয়া সম্ভব হয়েছ্ তার ভেতর ৯৮টি স্থিতিশীল, অন্যগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি এবং সেগুলো অস্থিতিশীল। আমরা যখন একটি পরমাণুকে অস্থিতিশীল বলি, তখন বুঝিয়ে থাকি তার নিউক্লিয়াসটি অস্থিতিশীল।

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের জন্য শুধু প্রোটন দিয়ে নিউক্লিয়াস তৈরি হতে পারে না। তার মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক কিংবা আরো বেশি নিউট্রন থাকতে হয়। তারপরেও অনেক সময় নিউক্লিয়াসগুলো স্থিতিশীল হয় না; এবং নানা ধরনের রশ্মি বিকরণ করে। এই ধরনের নিউক্লিয়াসগুলোকে আমরা তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস বলে থাকি। নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণের সময় এই ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয়ে মানুষের জীবনের ভয়াবহ সর্বনাশ করে থাকে।

তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসগুলো থেকে যে রশ্মিগুলো বের হয়, সেগুলোর নাম আলফা, বেটা এবং গামা রশ্মি। এই রশ্মিগুলোর গঠন এবং বৈশিষ্ট্য তোমরা একটু উপরের ক্লাসে গিয়ে জানতে পারবে।

পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী

তোমরা সবাই এর মধ্যে জেনে গেছ যে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, সেগুলো তৈরি হয়ে মাত্র ৯৮ টি প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া পরমাণু দিয়ে। এই পরমাণুগুলোর গঠনও তোমরা এখন জানো, কেন্দ্রে খুবই ক্ষুদ্র একটি নিউক্লিয়াস এবং সেটিকে ঘিরে ঘুরছে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে নিয়মমাফিক সাজানো থাকে, শেষ কক্ষপথে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে, সেই ইলেকট্রন গুলোই আসলে পরমাণুর ধর্ম নির্ধারিত হয়। তাই কোনো কোনো পরমাণু একেবারে নিষ্ক্রিয়, আবার কোনো কোনো পরমাণু ভয়াবহ রকমের সক্রিয়। পরমাণু দিয়ে কীভাবে অণু তৈরি হয়, সেটি যখন পড়বে তখন তোমরা সেই বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে জানতে পারবে।

যাই হোক পরমাণুর শেষ কক্ষপথে বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমরা বেশ কিছু পরমাণুকে দুই ভাগে ভাগ করেছি, সেটি হচ্ছে ধাতু এবং অধাতু। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই মোটামুটিভাবে এই দুটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত। সোনা রুপা লোহা তামা এগুলো হচ্ছে ধাতুর উদাহরণ। ধাতুর বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী। তোমরা এখন যেহেতু পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জেনে গেছ, তাই ধাতুগুলো কেন বিদ্যুৎ এবং তাপ পরিবাহী হয়, সেটিও এখন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ধাতু জাতীয় পরমাণুগুলোর শেষ কক্ষপথে যে ইলেকট্রন থাকে সেগুলো সাধারণত খুব দুর্বলভাবে আটকে থাকে বা ‘প্রায়-মুক্ত’, খুব সহজেই সেটি এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে যেতে পারে। যেহেতু তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবহন হয় এই ইলেকট্রন দিয়ে তাই ধাতুর পরমাণুতে যে প্রায়-মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, সেগুলো দিয়ে খুব সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করা যায়।

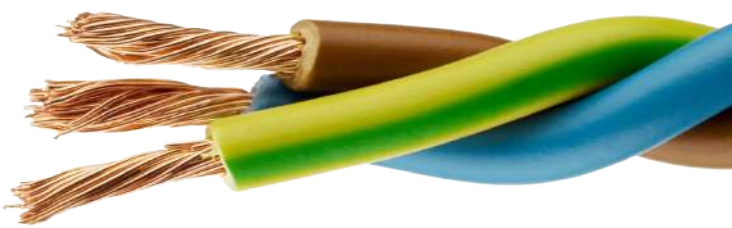

বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য তামার তার ব্যবহার করা হয়

কাজেই তোমরা একেবারে অধাতুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। অধাতুর পরমাণুর শেষ কক্ষপথে প্রায় মুক্ত কোনো ইলেকট্রন নেই, তাই সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার জন্য কোনো ইলেকট্রন নেই। সালফার (গন্ধক), ফসফরাস, নাইট্রোজেন, এগুলো হচ্ছে অধাতুর উদাহরণ।

পরিবাহী এবং অপরিবাহী পরমাণু ছাড়াও কিছু পরমাণুকে অর্ধপরিবাহী বা ইংরেজিতে সেমিকন্ডাক্টর বলে। ধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহী, তাই সেগুলোকে কন্ডাক্টর বলা হয়। কাজেই সেমিকন্ডাক্টর শব্দটি থেকেই বুঝতে পারছ এগুলো এমন এক ধরনের পরমাণু, যেগুলো পুরোপুরি পরিবাহী নয়, বিশেষ অবস্থায় এগুলো পরিবাহী হতে পারে, সেজন্য এগুলোকে বাংলায় অর্ধপরিবাহী বা ইংরেজিতে সেমিকন্ডাক্টর বলে।

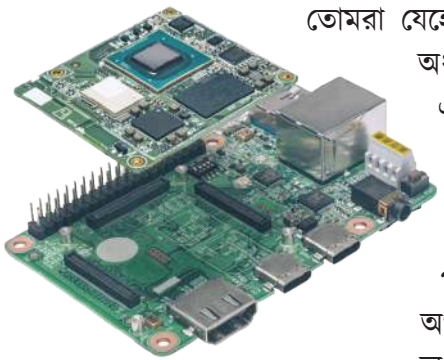

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয় সেমিকন্ডাক্টর।

তোমরা যেহেতু পরমাণুর গঠন জেনে গেছ তাই এখন ইচ্ছা করলে এই অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর গঠনটিও ব্যাখ্যা করতে পারবে। এ ধরনের পরমাণুতে শেষ কক্ষপথে বিদ্যুৎপ্রবাহ করার জন্য প্রায়-মুক্ত কোনো ইলেকট্রন থাকে না। কিন্তু যদি পরমাণুরকে উত্তপ্ত করা যায় তাহলে তাপশক্তি পরমাণুটির শেষ কক্ষপথ থেকে একটি ইলেকট্রনকে প্রায় মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারে। সেই প্রায়-মুক্ত ইলেকট্রনটি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে পারে অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, কোনো কোনো বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ অপরিবাহী পরমাণুকে উত্তপ্ত করে বিদ্যুৎ পরিবাহী পরমাণুতে রূপান্তরিত করা যায়। এই ধরনের পরমাণুকে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর বলে। সিলিকন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী পরমাণু।

বর্তমান সভ্যতায় একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ইলেকট্রনিকস। সেমিকন্ডাক্টর ছাড়া এই ইলেকট্রনিকস প্রযুক্তিটি এত চমৎকারভাবে কখনোই গড়ে তোলা সম্ভব হতো না।

অণু

বাংলা ভাষায় বর্ণমালা মাত্র ৫০টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কিন্তু এই ৫০টি বর্ণ দিয়ে অসংখ্য শব্দ তৈরি করা যায়। ঠিক একইভাবে মাত্র ১১৮টি ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু; কিন্তু সেগুলো দিয়ে অসংখ্য অণু তৈরি করা যায় এবং এই অণুগুলোই হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক, যেখানে যৌগিক পদার্থের সব গুণাবলি আছে। দুই বা দুইয়ের অধিক পরমাণু যদি রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে সেটাকে অণু বলে।

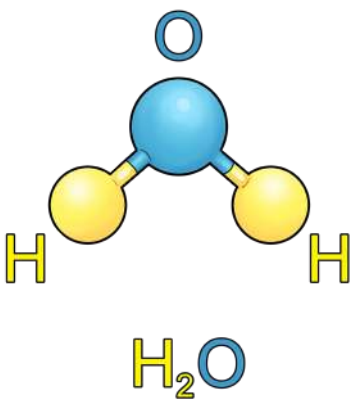

পানির অণুতে একটি অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু সংযুক্ত।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, পানি তৈরি হয়েছে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে। আমরা যদি এক ফোঁটা পানি নিয়ে সেটাকে বিভক্ত করতে থাকি তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা পানির একটি অণুতে পৌঁছাব, সেখানে পানির গুণাবলি পাওয়া যাবে। যদি

সেটিকে আরো বিভক্ত করার চেষ্টা করি তাহলে সেটি আর পানির অণু থাকবে না, সেটি দুইটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যাবে।

মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ দুইটিরই অণু থাকা সম্ভব। আমাদের পরিচিত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন গ্যাসের বেলায় সেগুলো আলাদা আলাদা পরমাণু হিসেবে থাকে না, সব সময় দুইটি পরমাণু একত্র হয়ে একটি অণু হিসেবে থাকে।

পরমাণুগুলো সাধারণত মুক্তভাবে থাকে না, সেগুলো অন্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অণু কিংবা যৌগিক পদার্থ হিসেবে থাকে। তবে এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে। তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ, পরমাণুর শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের বিন্যাস দিয়েই পরমাণু কতটুকু সক্রিয় হবে সেটি নির্ধারিত হয়। পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে কয়টি করে ইলেকট্রন থাকবে, সেটি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম দিয়ে নির্ধারিত আছে। কাজেই শেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকা সম্ভব, যদি তার সবগুলোই পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সেই পরমাণুটি অন্য পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রন বিনিময় করে সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। কাজেই সেই পরমাণুগুলো নিষ্ক্রিয় পরমাণু বলা হয় এবং সেগুলো গ্যাস হিসেবে থাকে। হিলিয়াম, আর্গন, নিয়ন, জিনন ইত্যাদি হচ্ছে এই ধরনের নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উদাহরণ। এই গ্যাসগুলো অন্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অণু কিংবা যৌগিক পদার্থ না হয়ে মুক্ত পরমাণু হিসেবেই থেকে যায়।

আবার মৌলিক পদার্থের অনেক পরমাণু একসঙ্গে থাকলেই কিন্তু সেগুলো দিয়ে সবসময় অণু গঠিত হয় না। সোনা, রুপা বা লোহা এরকম ধাতুগুলোতে পরমাণুগুলো কঠিনভাবে সংযুক্ত থাকে এবং সেগুলোর বাইরের কক্ষপথের প্রায় মুক্ত ইলেকট্রনগুলো সব পরমাণুর ভেতর ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সেগুলো কোনো অণু তৈরি করে না। আবার হীরার কেলাসেও কার্বনের অণুগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থেকে স্ফটিক তৈরি করে, কিন্তু কোনো অণু তৈরি হয় না।

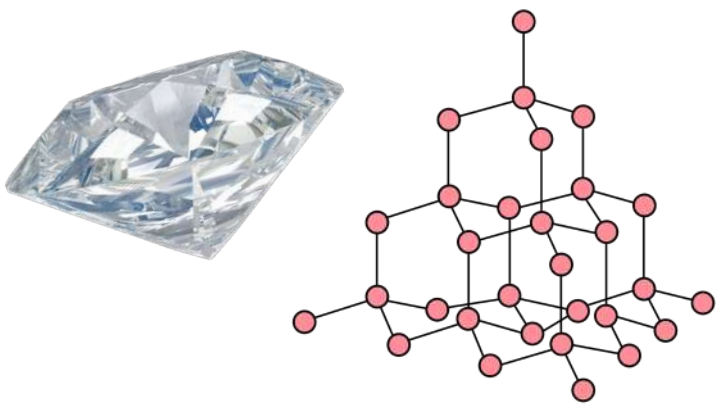

হীরাতে কার্বনের পরমাণুগুলো স্ফটিকের ভেতরে
সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নে সাজানো থাকে।

কঠিন, তরল ও গ্যাস

পদার্থের একটি ভর আছে এবং এটি খানিকটা জায়গা দখল করে থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় কোনো কোনো পদার্থ কঠিন, কোনো কোনো পদার্থ তরল আবার কোনো কোনো পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। তাপমাত্রা পরিবর্তন করে একই পদার্থকে কখনো কঠিন, কখনো তরল বা কখনো গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তর করা যায়। তোমরা একটু আগেই জানতে পেরেছ যে অণু, পরমাণু নামে খুবই ক্ষুদ্র একধরনের কণা দিয়ে পদার্থ তৈরি। এই কণাগুলো একটা পদার্থে কীভাবে থাকে, তার ওপর নির্ভর করে সেটি কি কঠিন তরল নাকি গ্যাস। এর একটা পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে পানি, যেটি একই পদার্থ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার কঠিন, তরল কিংবা গ্যাস হিসেবে থাকতে পারে, তার অণুগুলোর অবস্থার উপর নির্ভর করে এটি কি বরফ পানি নাকি জলীয় বাষ্প।

কঠিন, তরল ও গ্যাসের কণা।

কঠিন: কঠিন পদার্থের কণাগুলো খুব কাছাকাছি এবং নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে, একটির সাপেক্ষে অন্যটি নড়তে পারে না তাই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার হয়। কাছাকাছি থাকার কারণে কঠিন পদার্থের উপর চাপ প্রয়োগ করলে এগুলো সংকুচিত হয় না এবং গ্যাস কিংবা তরলের মতো প্রবাহিত করা যায় না।

তরল: পদার্থ যখন তরল অবস্থায় থাকে তখন কণাগুলো তুলনামূলকভাবে কাছে হলেও একটা কণা অন্য কণার সাপেক্ষে নড়তে পারে, তাই সেগুলোর নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও কোনো নিয়মিত আকার নেই এবং তরল সহজেই প্রবাহিত হয়। তরল পদার্থকে যে পাত্রে রাখা হয় তরল পদার্থ সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। তরল পদার্থের কণাগুলো কাছাকাছি থাকায় সেগুলোর মধ্যে ফাঁকা জায়গা নেই বলে চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায় না

গ্যাস: যখন কোনো পদার্থ গ্যাস অবস্থায় থাকে, তখন তার কণাগুলো মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব হয় বেশি। সেজন্য সেগুলোর কোনো নিয়মিত আকার বা আয়তন নেই, গ্যাসকে যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের পুরো আয়তন দখল করে। গ্যাসের কণাগুলোর মাঝখানে অনেক জায়গা বলে চাপ প্রয়োগ করে এগুলোকে সহজেই সংকুচিত করা যায়। গ্যাসের কণাগুলো অন্য কণার সাপেক্ষে ছুটতে পারে বলে গ্যাস সহজেই প্রবাহিত হয়।

অনুশীলনী ?

১। ১ চা চামুচে আনুমানিক ১ সিসি পদার্থ আঁটে। এক লিটার পানির ভর এক কেজি কাজেই ১ সিসি পানির ওজন ১ গ্রাম। তাহলে অনুমান করতে পারবে এক চা চামচ পানির নিউক্লিয়াসের ভর কত?

২। তুমি যদি পারমাণবিক সংখ্যা ১১৯ নম্বর পরমাণুটি আবিষ্কার করতে পারো তাহলে তার নাম কি দিবে? কেন?

অধ্যায় ৩

পদার্থের গঠন

অধ্যায় ৩ পদার্থের গঠন

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ পদার্থের গঠন
- ☑ পরমাণু এবং অণুর মধ্যে পার্থক্য
- ☑ মৌল, যৌগ এবং মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য
- ☑ বিশুদ্ধ পদার্থ শনাক্তকরণ
- ☑ প্রতীক এবং সংকেত ব্যবহার করে নির্দিষ্ট মৌল এবং যৌগ শনাক্তকরণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বায়ু, পানি, লোহা, খাবার, বই ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের বস্তু ব্যবহার করে থাকি। সেগুলো দেখতে বিভিন্ন রকম। কোনোটা গ্যাস, কোনোটা তরল, কোনোটা নরম, কোনোটা কঠিন, কোনোটা ভারী, কোনোটা হাল্কা, কোনোটা চকচকে—তোমরা বলে শেষ করতে পারবে না। পদার্থের এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণ হলো এগুলোর গঠন। যেহেতু পদার্থগুলোর গঠন একে অপরের থেকে ভিন্ন, তাই সেগুলো দেখতে ভিন্ন এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন হয়। পদার্থগুলোর এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

মৌলিক পদার্থ

আমাদের বহুল ব্যবহৃত কিছু পদার্থের গঠনের দিকে নজর দেওয়া যাক। এই ক্ষেত্রে, আমরা প্রথমে লোহা এবং তামা সম্পর্কে বলতে পারি। বিশুদ্ধ লোহাকে যতই ভাঙা হয় না কেন, সেখানে লোহা ছাড়া কিছু পাবে না। যে পদার্থ ভাঙলে সেই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক পদার্থ বলে। লোহার মতো তামাও মৌলিক পদার্থ, কারণ এক টুকরা তামা যতই ভাঙা হোক না কেন আমরা সেখানে তামা ছাড়া আর কিছু পাব না। আমরা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, সেটিও মৌলিক পদার্থ, কারণ এই গ্যাস যতই ভাগ করা হোক না কেন অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। লোহা এবং তামার মতো সোনা অথবা রুপা কিংবা হাইড্রোজেন বা নাইট্রোজেনও শুধু একটি উপাদান দিয়ে তৈরি এবং সেগুলোও মৌলিক পদার্থ বা মৌল।

যৌগিক পদার্থ

মৌলিক পদার্থকে ভাঙলে শুধু ঐ পদার্থকেই পাওয়া যায়। তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে পানিকে ভাঙলে আমরা অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এই দুটি ভিন্ন মৌলিক পদার্থ পাব। তার কারণ, পানি মৌলিক পদার্থ নয়, পানি যৌগিক পদার্থ। অর্থাৎ যে সকল পদার্থকে ভাঙলে দুই বা দুইয়ের অধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলোকে যৌগিক পদার্থ বলে। যৌগের ধর্ম, সেটি যে মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। পানি হচ্ছে তরল, কিন্তু অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন হচ্ছে গ্যাস। পানির মতো লবণ আর চিনিও যৌগিক পদার্থ। লবণ তৈরি হয়েছে মৌলিক পদার্থ সোডিয়াম আর ক্লোরিন দিয়ে এবং চিনি তৈরি হয়েছে মৌলিক পদার্থ কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে।

লোহার গায়ে মরিচা ধরার কথা কে না জানে? গাঢ়-ধূসর রঙের লোহার তৈরি রড (যা একটি মৌল) কিছু দিন বাইরে রাখা হলে, মরিচা নামে লাল বা বাদামি রঙের স্তর দেখা যাবে। আসলে বাষ্পের উপস্থিতিতে লোহার মৌল অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মরিচা বা ফেরিক অক্সাইড নামে একটি যৌগ তৈরি করে।

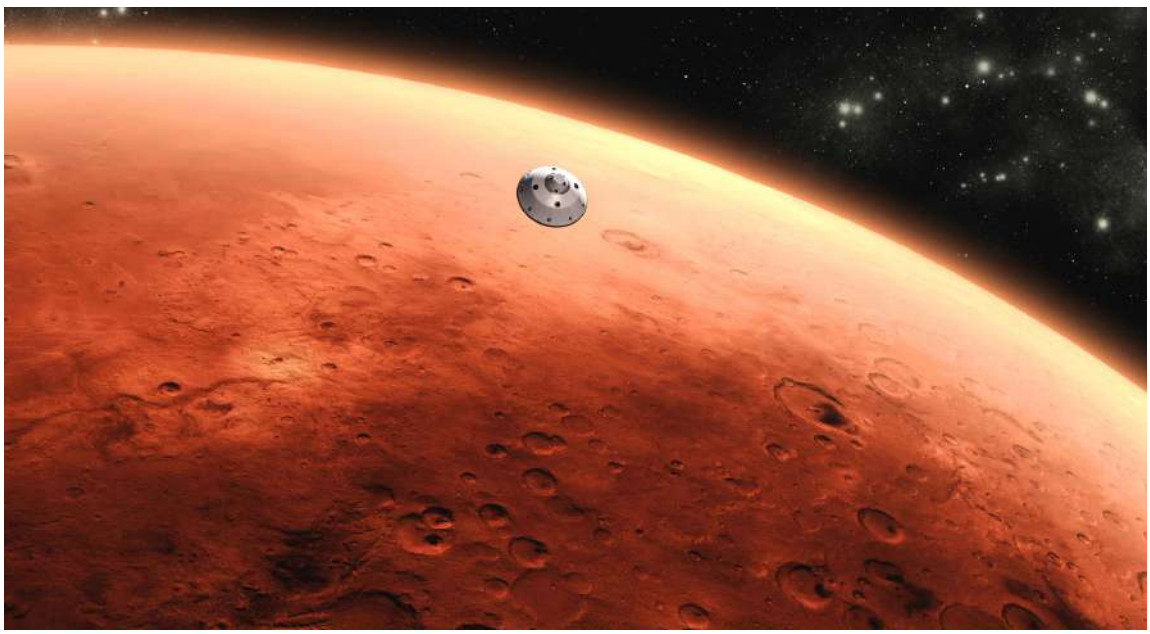

লালাভ ফেরিক অক্সাইডের উপস্থিতির জন্য মঙ্গল গ্রহের রং লাল।

মিশ্রণ ও বিশুদ্ধ পদার্থ

এক গ্লাস পানিতে কিছু লবণ মিশিয়ে নাড়ো। এখানে লবণ ও পানির মতো দুই বা ততোধিক পদার্থের একত্রে অবস্থান করাকে মিশ্রণ বলে। লবণ আর পানি মিশ্রিত হলেও মিশ্রণের ভেতরে সেগুলো নিজ ধর্ম বজায় রাখে। অর্থাৎ একটি মিশ্রণে দুই বা ততোধিক ভিন্ন পদার্থ থাকে যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় না, মিশ্রণের বিভিন্ন পদার্থ মৌল বা যৌগ হিসেবে থাকতে পারে। একইভাবে বায়ুও একটি মিশ্রণ, যেখানে নাইট্রোজেন,

অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড বা বাষ্প ইত্যাদির মতো বিভিন্ন পদার্থ বিদ্যমান। লক্ষণীয় যে লবণ আর পানির মিশ্রণে বিদ্যমান পানি এবং লবণ উভয় পদার্থ হলো যৌগ। অন্যদিকে, বায়ু এমন একটি মিশ্রণ, যেখানে মৌল ও যৌগ উভয় রকমেরই পদার্থ বিদ্যমান। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন হচ্ছে মৌল কার্বন ডাইঅক্সাইড আর বাষ্প হলো যৌগ।

একটি মিশ্রণে দুই বা ততোধিক ভিন্ন পদার্থ থাকে, যেগুলো রাসায়নিকভাবে যুক্ত নয়। অন্যদিকে বিশুদ্ধ পদার্থ বলতে আমরা বোঝাই যে সেটি শুধু একটি উপাদান বা একটি যৌগ নিয়ে গঠিত। বিশুদ্ধ শব্দটি তার দৈনন্দিন অর্থ থেকে ভিন্ন উপায়ে এখানে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দোকানে যখন আমের 'খাঁটি' রস বিক্রি করা হয় তখন বোঝানো হয় সেখানে শুধু আমের রস রয়েছে, অন্য কোনো পদার্থ যোগ করা হয়নি। তবে আমের 'খাঁটি' রস রাসায়নিক অর্থে বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এতে বিভিন্ন পদার্থ একত্রে মিশে থাকে।

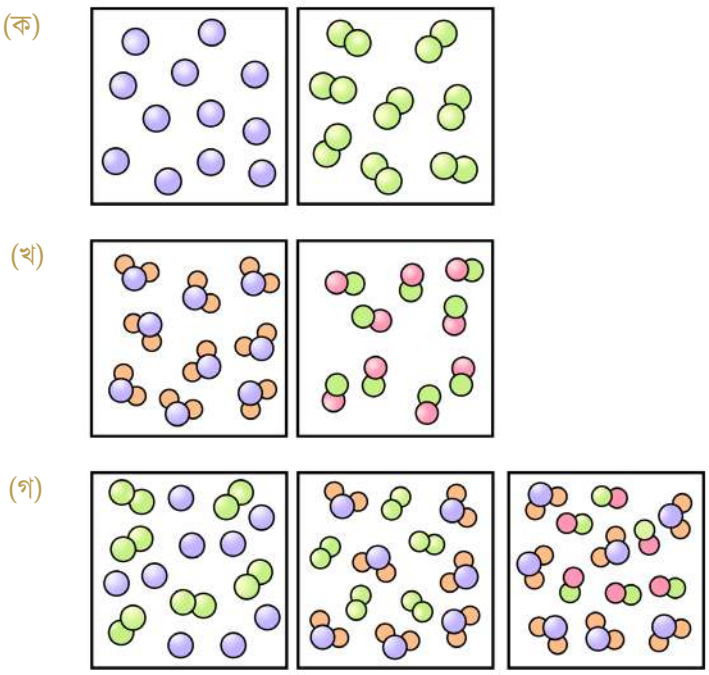

(ক) মৌলিক পদার্থের পরমাণু এবং অণু,

(খ) যৌগিক পদার্থের দুই ধরনের অণু,

(গ) মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ, মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ এবং যৌগিক পদার্থের সঙ্গে যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ

বিশুদ্ধ পদার্থ শনাক্তকরণ

পদার্থের ভৌত ধর্ম হলো এমন বৈশিষ্ট্য যা পদার্থের প্রকৃত রূপ পরিবর্তন না করেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। রং, গন্ধ, ঘনত্ব, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক এবং দ্রাব্যতা হলো ভৌত ধর্মের উদাহরণ। ভৌত ধর্ম একটি বিশুদ্ধ পদার্থ শনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন বিশুদ্ধ পদার্থের একটি নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে; কিন্তু মিশ্রণের কোনো নির্দিষ্ট গলনাংক থাকেনা। কাজেই গলনাংক পরিমাপ করে বলে দেওয়া যেতে পারে একটি পদার্থ বিশুদ্ধ পদার্থ নাকি মিশ্রণ। যদি মিশ্রণের উপাদানগুলো আলাদা করার প্রয়োজন হয়, সেগুলো সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়া ছাড়াই আলাদা করা যায়।

কাজেই আমরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে এভাবে ভাগ করতে পারি:

মৌল: মৌলে শুধু এক ধরনের পরমাণু থাকে। যেমন: সোনা, রুপা, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন।

যৌগ: একটি যৌগে দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রে যুক্ত থাকে। যেমন: পানি, লবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড।

মিশ্রণ: একটি মিশ্রণে দুই বা ততোধিক ভিন্ন পদার্থ থাকে যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। মিশ্রণকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

- বিভিন্ন মৌলের মিশ্রণ, যেমন: অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ
- বিভিন্ন মৌল ও যৌগের মিশ্রণ, যেমন: বাতাস: অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের মিশ্রণ
- বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণ, যেমন: পানি আর লবণের মিশ্রণ।

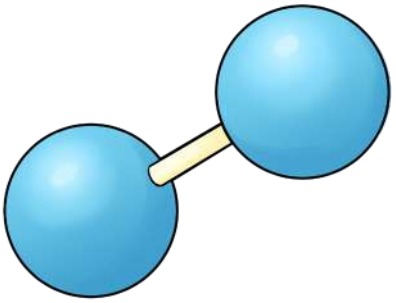

অক্সিজেনের অণু দুইটি অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে তৈরি।

পরমাণু, অণু এবং যৌগ

বিজ্ঞানী ডাল্টন প্রথমে তার পারমাণবিক তত্ত্বে বলেছিলেন, পদার্থ পরমাণু নামে অত্যন্ত ছোট ছোট কণা নিয়ে গঠিত। নিস্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু ছাড়া অন্য পরমাণু সাধারণত মুক্ত বা স্বাধীন থাকতে পারে না, সেগুলো একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অণু গঠন করে। পরমাণু হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক যা একটি মৌলের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখে।

একটি অণু মুক্ত বা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। যৌগিক পদার্থের বেলায় একটি অণু হলো তার ক্ষুদ্রতম একক (কণা) যা ঐ যৌগের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম বহন করে। মৌলের ক্ষেত্রে, শুধু একই পদার্থের পরমাণু একত্র হয়ে অণু গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, দুটি অক্সিজেন পরমাণু একত্র হয়ে অক্সিজেন অণু গঠন করে।

পরমাণু এবং প্রতীক (Symbol)

আগের পাঠ থেকে তোমরা জানতে পেরেছ যে, এখন পর্যন্ত ১১৮টি মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে ৯৮টি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং বাকি ২০টি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি মৌলের একটি নাম আছে। তাদের সংক্ষিপ্ত এবং সহজে প্রকাশ করতে আমরা সেগুলোর প্রতিটির জন্য প্রতীক ব্যবহার করি। সাধারণত প্রতীকগুলো মৌলের ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের প্রথম একটি বা দুটি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একটি অক্ষর দিয়ে প্রতীক প্রকাশের ক্ষেত্রে বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা হয়। দুটি অক্ষর দিয়ে প্রতীক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথমটি হবে বড় অক্ষরে এবং দ্বিতীয়টি ছোট অক্ষরে। যদি দুই বা দুইয়ের অধিক মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর একই হয়, তবে একটি মৌলকে নামের প্রথম অক্ষর (ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অন্যগুলোর ক্ষেত্রে প্রতীকটি দুই অক্ষরে লেখা হয়।

পরমাণুর কিছু প্রতীক এবং সেগুলোর ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের উদাহরণ দেওয়া হলো।

অণু এবং সংকেত (Formula)

আমরা শিখেছি যে দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমন্বয়ে অণু তৈরি হয়। সংকেত থেকে কোন অণুতে কোন পরমাণু কতগুলো করে আছে, তা জানা যায়। একটি সংকেত আসলে একটি অণুর সংক্ষিপ্ত রূপ। অণু গঠনকারী পরমাণুর চিহ্ন দিয়ে একটি সংকেত লেখা হয়। এখন আমরা সংকেত লেখার নিয়ম এবং সংকেত থেকে কি বোঝা যায় তা জানব।

মৌলের উদাহরণ

যেসকল মৌল সাধারণত, তরল ও কঠিন অবস্থায় থাকে, সেখানে অসংখ্য পরমাণু একসঙ্গে অবস্থান করে কিন্তু সেগুলো কোনো অণু গঠন করেনা। যার ফলে, সোডিয়াম, তামা এবং লোহার মতো এই জাতীয় মৌলের জন্য অণু হিসেবে কোনো সংকেত নেই। তবে কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া বেশির ভাগ গ্যাসীয় পদার্থ দুটি মৌল একত্র হয়ে একটি অণু গঠন করে। যার ফলে, এসব মৌলের সংকেত হিসেবে সেগুলোর প্রতীকের সঙ্গে ছোট করে '২' (2 as subscript) লিখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অক্সিজেনের সংকেত হলো O_2 এবং নাইট্রোজেনের সংকেত হলো N_2। তবে কিছু কিছু মৌল আছে যেগুলো কঠিন এবং তরল অবস্থাতেও নিজেদের দুটি পরমাণু একত্র হয়ে অণু গঠন করে। সেগুলোর সংকেতও ঠিক আগের মতো করে লিখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ব্রোমিন (তরল) এর সংকেত Br_2।

অণু এবং যৌগিক পদার্থের উদাহরণ

পানি: যৌগের সংকেত থেকে আমরা জানি কোন কোন মৌলের পরমাণুর সমন্বয়ে যৌগটি গঠিত এবং ঐ যৌগে সেসব উপাদান মৌলের পরমাণুর অনুপাত কত। উদাহরণস্বরূপ, H_2O সংকেত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে একটি পানির অণু গঠিত হয়েছে।

মৌলের নামকরণ (ইংরেজি নাম)

মৌল	ইংরেজি নাম	প্রতীক
হাইড্রোজেন	Hydrogen	H
অক্সিজেন	Oxygen	O
নাইট্রোজেন	Nitrogen	N

মৌলের নামকরণ (ল্যাটিন নাম)

মৌল	ল্যাটিন নাম	প্রতীক
লোহা	Ferrum	Fe
তামা	Cuprum	Cu
সোনা	Aurum	Au
রুপা	Argentum	Ag
সোডিয়াম	Natrium	Na

মৌলের নামকরণ (প্রথম অক্ষর এক)

মৌল	ইংরেজি নাম	প্রতীক
কার্বন	Carbon	C
ক্লোরিন	Chlorine	Cl
ক্যালসিয়াম	Calcium	Ca

মৌল	প্রতীক	সংকেত
হাইড্রোজেন	H	H_2
নাইট্রোজেন	N	N_2
অক্সিজেন	O	O_2
ফ্লোরিন	F	F_2
ক্লোরিন	Cl	Cl_2
ব্রোমিন	Br	Br_2
আয়োডিন	I	I_2

কার্বন ডাইঅক্সাইড: আমাদের পরিচিত আরেকটি গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করি, কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করি। বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্ট-এর মাধ্যমে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার ভয়াবহ পরিবর্তন হচ্ছে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণু তৈরি হয় কার্বন এবং অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে। এই অণুতে একটি কার্বনের পরমাণুর সঙ্গে দুইটি অক্সিজেনের পরমাণু থাকে। কার্বনের প্রতীক C, অক্সিজেনের O, তাই কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণুর সংকেত CO_2। কার্বন এবং অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে আরো একটি অণু তৈরি হয় সেই অণুটির নাম কার্বন-মনোক্সাইড। কার্বন মনোক্সাইডে একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে একটি অক্সিজেনের পরমাণু যুক্ত হয় এবং তার সংকেত হচ্ছে CO। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটি মোটামুটি নিরীহ একটি গ্যাস; কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড অত্যন্ত ভয়ংকর বিষাক্ত একটি গ্যাস। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, একই পরমাণু ব্যবহার করে খুবই সাধারণ অণু যেরকম তৈরি করা যায়, ঠিক সেরকম সম্পূর্ণ ভিন্ন খুবই বিষাক্ত গ্যাসের অণু তৈরি করা যায়।

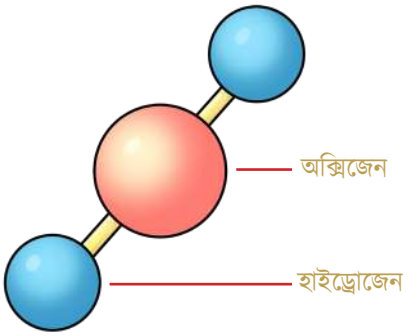

কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণু তৈরি হয়েছে একটি কার্বন এবং দুইটি অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে।

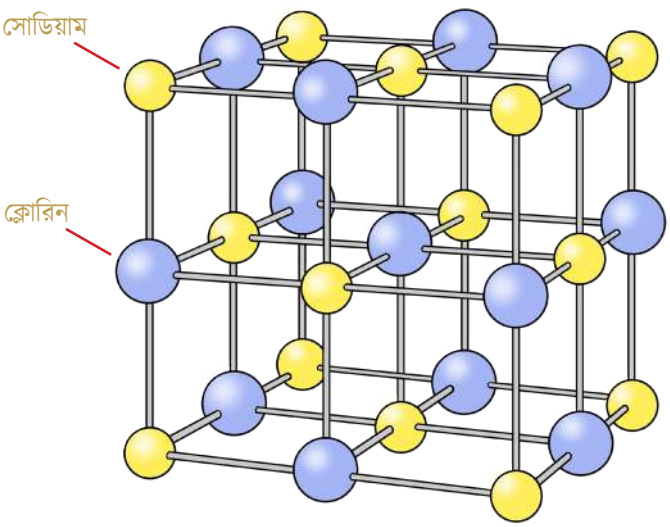

লবনে সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের সুসজ্জিত কেলাস।

লবণ: আমরা তরল হিসেবে পানি এবং বিভিন্ন গ্যাসের অণুর কথা বলেছি, এবারে আমরা কঠিন পদার্থের অণুর উদাহরণ দিই। আমরা সবাই প্রতিদিনই আমাদের খাবারের সঙ্গে লবণ ব্যবহার করি। লবণ তৈরি হয় সোডিয়াম (Na) এবং ক্লোরিন (Cl) এর পরমাণু দিয়ে। যেহেতু লবণের যৌগিক পদার্থে একটি সোডিয়াম এবং একটি ক্লোরিনের পরমাণু থাকে, তাই লবণের সংকেত হচ্ছে NaCl। তরল কিংবা গ্যাসে অণুগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে না, সেগুলো ক্রমাগত নড়াচড়া করতে থাকে। কিন্তু কঠিন পদার্থে অণুগুলো নির্দিষ্ট স্থানে আটকে থাকে। সে দিক দিয়ে লবণের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য আছে। লবণের অণুগুলো এলোমেলোভাবে না থেকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কেলাস বা ক্রিস্টাল হিসেবে সাজানো থাকে।

সোডিয়ামের পরমাণুটি অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল একটি ধাতু। খোলা বাতাসে রাখলে এটিতে আগুন ধরে যেতে পারে, আবার পানির সঙ্গে এটি ভয়ংকরভাবে বিক্রিয়া করে বলে সোডিয়ামকে সব সময় কেরোসিনে ডুবিয়ে রাখতে হয়। একইভাবে ক্লোরিনও খুবই বিক্রিয়াশীল এবং বিষাক্ত একটি গ্যাস, কিন্তু তোমরা সবাই জানো, এই সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের পরমাণু মিলে যে লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড নামে যে যৌগিক পদার্থ তৈরি

হয়, সেটি মোটেও বিক্রিয়াশীল বিপজ্জনক কোনো পদার্থ নয়। আমরা প্রতিদিন লবণ খাই এবং আমাদের শরীরের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয় একটি পদার্থ। শুধু তাই নয়, লবণের কেলাসের ভেতর সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এত শক্তভাবে আবদ্ধ থাকে যে হঠাৎ করে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন মুক্ত হয়ে কোনো বিপদ তৈরি করতে পারে না।

সোডা: আমরা এখন পর্যন্ত শুধু দুটি পরমাণু দিয়ে তৈরি অণুর উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু দুই থেকে বেশি পরমাণু দিয়েও অণু তৈরি হওয়া সম্ভব। যেমন কাপড় ধোয়ার সোডা সোডিয়াম, কার্বন এবং অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে তৈরি। কাপড় ধোয়ার সোডার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেট এবং তার সংকেত হচ্ছে Na_2CO_3। কাজেই সংকেতটি দেখেই তোমরা অনুমান করতে পারছ, যে সোডিয়াম কার্বনেটে অণুর মধ্যে দুইটি সোডিয়ামের পরমাণু, একটি কার্বনের পরমাণু এবং তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু থাকে।

চিনি: আমরা সবাই মিষ্টি চিনির সঙ্গে পরিচিত। মিষ্টি খেতে ভালো লাগে বলে অনেক সময় বেশি চিনি

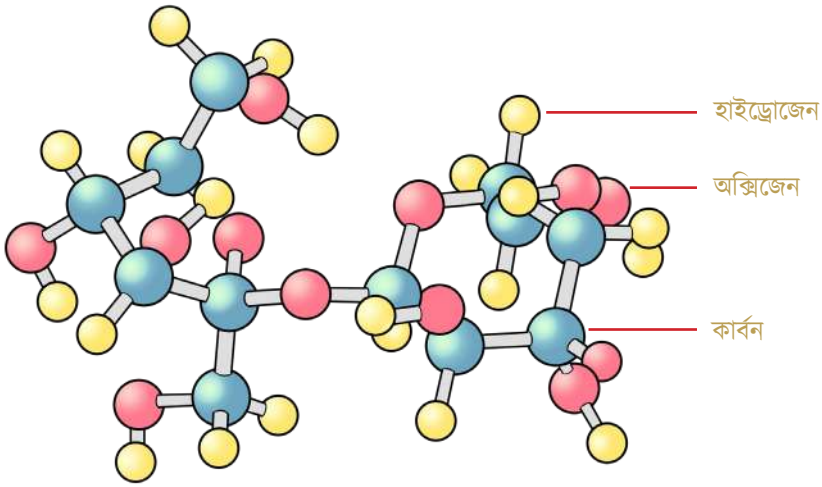

কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে তৈরি চিনির অণু।

খাওয়ার কারণে আমরা নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়ি। চিনির অণুটি তৈরি হয়েছে কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেনের (O) পরমাণু দিয়ে। চিনির সংকেত হচ্ছে $C_{12}H_{22}O_{11}$ এবং এটা দেখেই বুঝতে পারছ চিনির অণুতে ১২টি কার্বন, ২২টি হাইড্রোজেন এবং ১১টি অক্সিজেনের পরমাণু রয়েছে। এখন পর্যন্ত তোমাদের যে কয়টি অণুর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পরমাণু দিয়ে তৈরি!

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড: তোমরা সবাই নিশ্চয়ই কমবেশি অ্যাসিড শব্দটি শুনেছ। লেবুর রস কিংবা ভিনেগারে দুর্বল অ্যাসিড থাকে এবং আমরা সেগুলো খাবারের মধ্যে ব্যবহার করি। এর পাশাপাশি কিছু অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যাসিড আছে, যেগুলো লোহাকে গলিয়ে ফেলতে পারে, চামড়ার সংস্পর্শে আসলে সঙ্গে সঙ্গে চামড়াকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। সেরকম কয়েকটি অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডগুলো খুবই সাবধানে ব্যবহার করতে হয় এবং কেউ ইচ্ছা করলেই সেটি বাজার থেকে কিনে আনতে পারে না।

কিন্তু একটি বিস্ময়কর ব্যাপার কি জানো? এই তিনটি অত্যন্ত বিপদজনক অ্যাসিডের ভেতর একটি অ্যাসিড

কিন্তু তোমার নিজের অজান্তেই বহন করো এবং সারাক্ষণ ব্যবহার করে যাচ্ছ; সেটি হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, একটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু এবং একটি ক্লোরিন (Cl) পরমাণু দিয়ে তৈরি, এই অ্যাসিডের সংকেত হচ্ছে HCl। তোমার পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক করার জন্য সেখানে এই অ্যাসিড থাকে। যদিও এটি চামড়ার সংস্পর্শে এলে চামড়া পুড়ে যায়; কিন্তু পাকস্থলীর আবরণের কোনো ক্ষতি না করেই সেটি পাকস্থলীতে সংরক্ষণ করতে পারে।

মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ, অণু এবং পরমাণু সম্পর্কে বলার সময় শুধু পরিচিত পদার্থের উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পদার্থগুলো তোমাদের আশপাশে আছে এবং তোমরা এগুলো প্রতিদিন কিংবা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকো। তোমরা যখন উপরের ক্লাসে যাবে, তখন মৌলিক পদার্থ, যৌগিক, পরমাণু, অণু এবং সেগুলোর ভেতরকার বিভিন্ন রাসায়নিক বন্ধন সম্পর্কে আরো নতুন নতুন বিষয় জানতে পারবে। যেমন তোমরা জানতে পারবে পানির অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে সবসময় দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। কেন দুইটির বেশি কিংবা কম থাকে না? একইভাবে তোমরা জানতে পারবে কেন লবণের অণুতে একটি সোডিয়ামের পরমাণুর সঙ্গে সব সময় একটি ক্লোরিনের পরমাণু যুক্ত হয়, বেশি বা কম কেন যুক্ত হয় না?

তোমরা যতই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে, ততই প্রকৃতির এরকম নানা ধরনের বিস্ময়কর রহস্য তোমাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে।

অনুশীলনী ?

১। পরমাণু মাত্রই মৌলিক পদার্থ কিন্তু মৌলিক পদার্থ মাত্রই পরমাণু নয়। কথাটি কি সত্যি? সত্যি হলে উদাহরণ দাও?

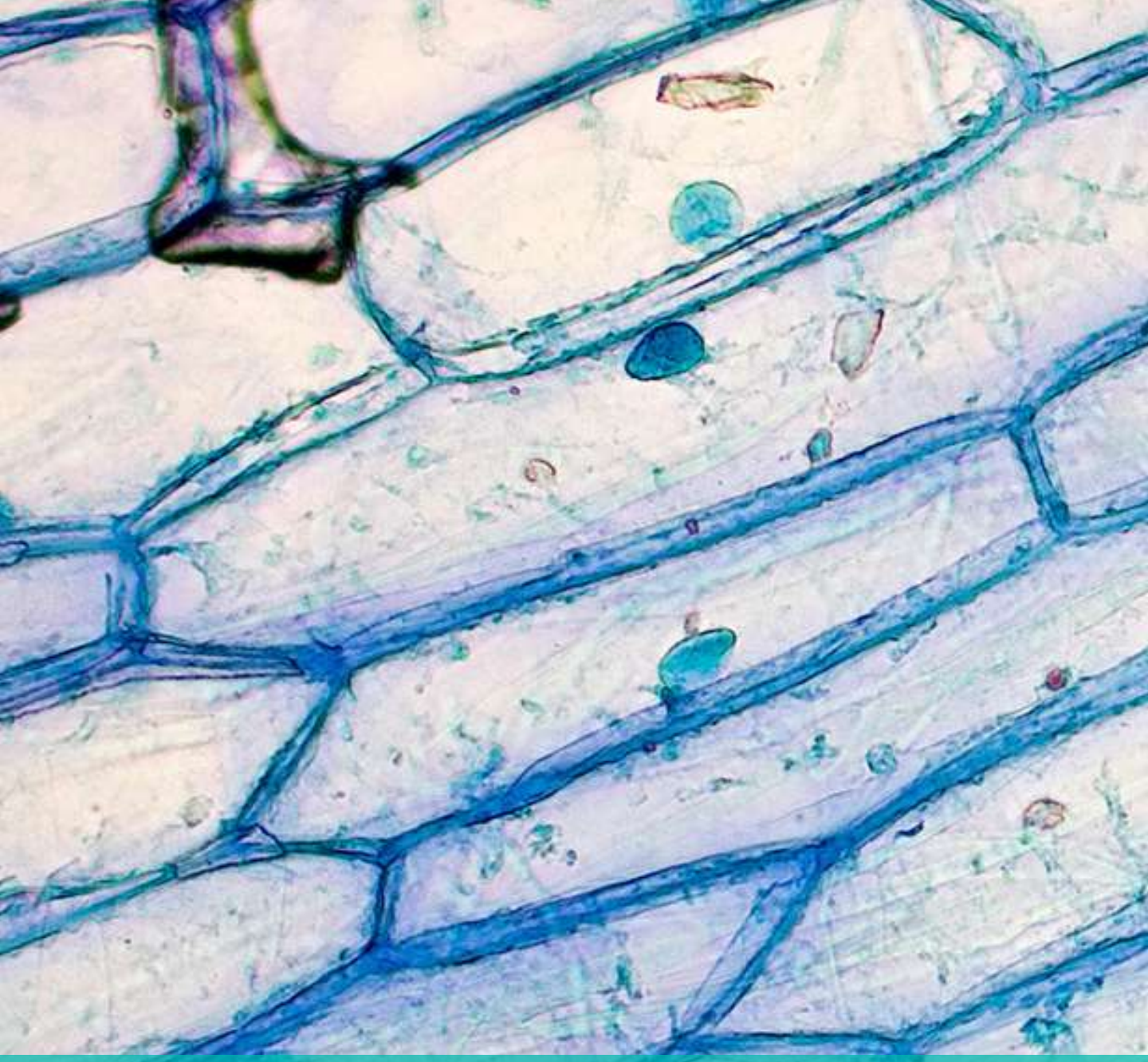

অধ্যায় ৪

কোষবিজ্ঞান

অধ্যায় ৪ কোষবিজ্ঞান

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের প্রধান অঙ্গাণুগুলোর গঠন এবং কাজ
- ☑ কোষের বিভাজন ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- ☑ অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের পরিণতি

স্কুল ঘরের বাইরে তাকালেই তুমি দেখবে, আমাদের চারপাশে কত রকম জীবনের সমাহার! ছোট-বড় গাছ, নানান রঙের পাখি, পোষা প্রাণী আর মানুষ তো আছেই। এসব জীব আমাদের চোখের সামনেই ছোট থেকে বড় হয়। একটি জড় পদার্থ (যেমন, বই, কলম বা ঘর) নিজে নিজে বড় হয় না। অথচ একটা জীব কিন্তু সময়ের সঙ্গে একটু একটু করে বড় হয়। কীভাবে ঘটে এই ব্যাপারটি? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের ফিরতে হবে ছোট থেকে আরো ছোট পর্যায়ে। জানতে হবে জীবনের গাঠনিক এককের পরিচয়।

তোমরা এর মধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গেছ, যে জীবের গাঠনিক একক হচ্ছে কোষ। আমরা ছোট বড় যত জীব দেখি, সেগুলোর সবগুলোরই গঠনের একক হিসেবে আছে কোষ। জীবের বড় হবার প্রক্রিয়ায় সেগুলোর নতুন নতুন কোষ তৈরির প্রয়োজন হয়। এসব নতুন নতুন কোষ কীভাবে তৈরি হয়? কীভাবে জীবের বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়? এমন প্রশ্ন আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভেবেছেন এবং আনন্দের বিষয় হচ্ছে, তারা গবেষণা করে এগুলোর উত্তরও বের করেছেন। আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করব এখানে। জানব জীবকোষের পরিচয়, সেগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতি, কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় যদি কোনো ভুল হয়, তবে তা জীবের জন্য কী পরিণতি ডেকে আনে ইত্যাদি। তবে তার আগে আমাদের কোষের গঠন উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জেনে নিতে হবে।

কোষ পরিচিতি

সকল জীবই কোষ নিয়ে গঠিত। বাংলা কোষ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Cell, যার আক্ষরিক অর্থ ছোট ঘর বা প্রকোষ্ঠ। Cell নামকরণটি করেছেন বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hooke), যিনি অণুবীক্ষণযন্ত্রের (Microscope) আবিষ্কারক। তিনি অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের পর একটি বোতলের কর্ক (Cork কাঠ থেকে তৈরি করা একধরনের ছিপি যা বোতলে মুখ বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়) পর্যবেক্ষণ করছিলেন। খালি চোখে যা দেখা যায় না, তাই তিনি দেখলেন অণুবীক্ষণযন্ত্রের ক্ষমতা ব্যবহার করে। কর্কের কাঠের কোষগুলো

একের পর এক ছোট ছোট ঘরের মতো করে সাজানো দেখাচ্ছিল বলেই রবার্ট হুক এগুলোর নাম দিলেন সেল (Cell)।

আমরা ইটের পর ইটের গাঁথুনিতে যেমন একটি বড় বাড়ি তৈরি হতে দেখি, তেমনি কোষের পর কোষ

রবার্ট হুকের দেখা কর্কের কোষ

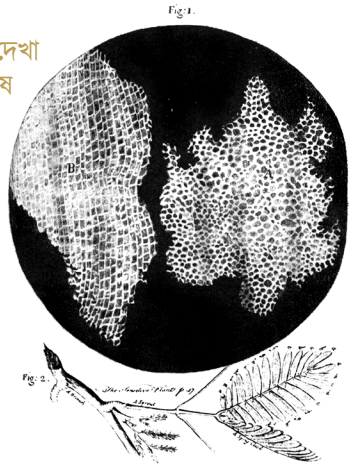

রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণযন্ত্র

রবার্ট হুক অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে উদ্ভিদ কোষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন

যুক্ত হয়ে একটি বহুকোষী জীবদেহ তৈরি হয়। বহুকোষী জীবদেহে কোটি কোটি কোষ থাকতে পারে। তবে বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থান ও জীবদেহের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে কোষগুলোর মধ্যে আকৃতি ও কাজের ভিন্নতা থাকে। যেমন, মানব শরীরের মস্তিষ্ক ও কিডনির কোষগুলো দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, সেগুলোর কাজও আলাদা। কিন্তু সেগুলোর গঠন উপাদান অনেকটা একইরকম। এসব উপাদান নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

কোষকে বলা হয় জীবের গঠন এবং কাজ সম্পাদনের একক (Structural and functional unit)। অর্থাৎ একটি জীবের শারীরিক গঠনের একক হচ্ছে কোষ, আবার তার যেকোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রাথমিক জায়গাটাও হচ্ছে কোষ। কিছু কিছু জীব আছে যেগুলো এককোষী, যেমন- ব্যাকটেরিয়া (Bacteria), অ্যামিবা (Amoeba), ইস্ট (Yeast) ইত্যাদি। এককোষী জীব এতই ক্ষুদ্র যে, সাধারণত অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এগুলোকে দেখা যায় না। আমরা আমাদের খালি চোখে যত জীব দেখি, সেগুলো সবাই বহুকোষী। যেমন- গাছপালা, মানুষ, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি বহুকোষী জীব। এসব জীব তৈরি হয় অনেক অনেক কোষ মিলে।

বিভিন্ন জীব দেখতে আলাদা হলেও সেগুলোর গঠন ও কাজ সম্পন্নকারী কোষগুলোর মৌলিক উপাদান একইরকম। সকল জীবের কোষই শর্করা বা কার্বহাইড্রেট (Carbohydrate), লিপিড (Lipid), প্রোটিন (Protein) নামের জৈব অণু দিয়ে তৈরি হয়।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যার প্রতিটি অণুতে কার্বনের (C) সঙ্গে হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) থাকে, যেখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত হয় ঠিক পানির মতো ২:১। জীবদেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

লিপিড জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম, যা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। লিপিডের প্রধান কাজ হচ্ছে শক্তি সঞ্চয় করে রাখা, কোষ পর্দার গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করা ইত্যাদি।

প্রোটিন হলো এক প্রকারের বৃহৎ আকারের জৈব অণু, যা একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের (এক ধরনের জৈব অণু) মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ বা বন্ধনের মাধ্যমে তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রোটিন জীবদেহের ভেতরে নানা কাজ সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ করে।

উপাদানের দিক থেকে একই হলেও ভিন্ন জীবের কোষগুলোর ভেতরে গঠনগত পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের ভেতর গঠনগত কিছু পার্থক্য আছে। এমনকি মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের কোষগুলোও গঠন ও কাজের দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। একটি কোষ যেসব ছোট ছোট অংশ নিয়ে গঠিত হয়, সেগুলোকে কোষের অঙ্গাণু (Organelle) বলা হয়। নিচে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর কাজ সম্বন্ধে জানব।

উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের প্রধান অঙ্গাণুগুলোর গঠন এবং কাজ

আকার এবং আয়তনের দিক থেকে কোষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও এগুলোর গঠন উপাদান বেশ বৈচিত্র্যময়। আর কোষের এসব গঠন উপাদানের কাজের পরিধিও বিস্তৃত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোষীয় অংশ হলো- (ক) কোষ প্রাচীর, (খ) কোষ ঝিল্লি এবং (গ) প্রোটোপ্লাজম। সংক্ষেপে এগুলোর গঠন এবং কাজ বর্ণনা করা হলো-

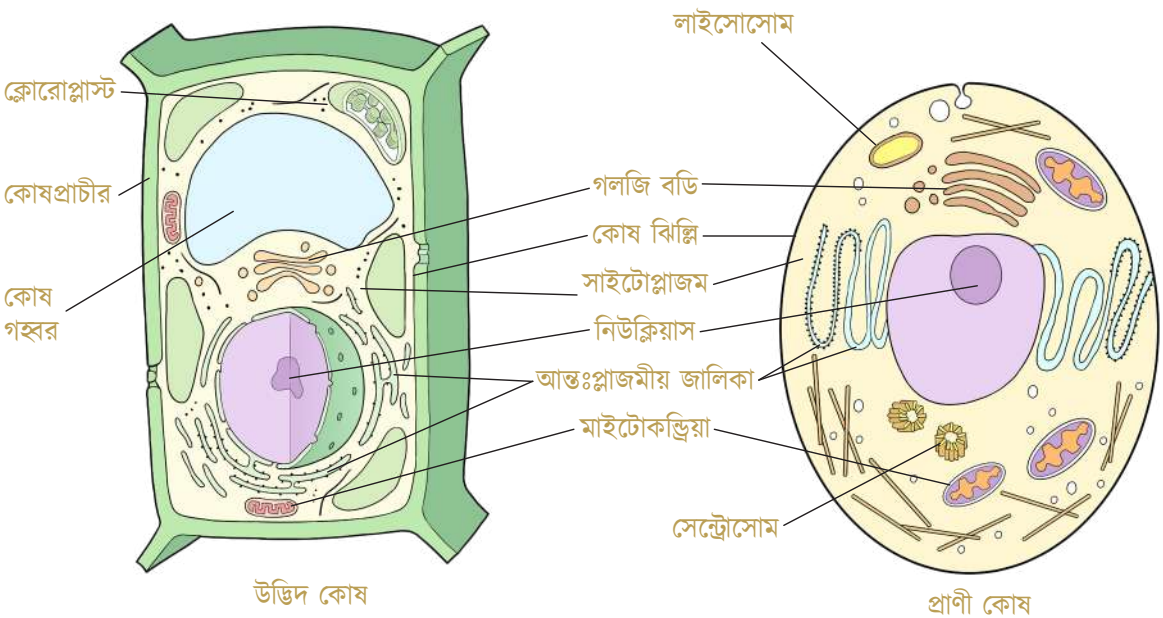

(ক) কোষপ্রাচীর (Cell wall): উদ্ভিদ এবং কিছু অণুজীব কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোষপ্রাচীর। কোষের একেবারে বাইরের দিকে শক্ত আবরণকে বলা হয় কোষপ্রাচীর। প্রাণী কোষে কোষপ্রাচীর থাকে না। উদ্ভিদ কোষের কোষপ্রাচীরের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো- সেলুলোজ (Cellulose) নামে কার্বোহাইড্রেট। একই সঙ্গে লিগনিন (Lignin) নামে এক ধরনের জৈব পদার্থ (যা বেশির ভাগ উদ্ভিদের মূল কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করে) উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে পাওয়া যায়।

অপরদিকে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের মূল উপাদান হচ্ছে কিছু প্রোটিন ও লিপিড। ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে কাইটিন (Chitin) জাতীয় এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট থাকে। সুতরাং, অনেক জীবে কোষপ্রাচীর থাকলেও, সেগুলোর গঠন উপাদানে কিছুটা পার্থক্য থাকে।

কোষপ্রাচীর কোষের নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে, বাইরের প্রতিকূল অবস্থা থেকে ভেতরের বস্তুকে রক্ষা করে, কোষকে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা প্রদান করে, পানি ও খনিজ লবণ শোষণ-পরিবহনে সহায়তা করে এবং পাশাপাশি কোষগুলোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে রাখে।

(খ) কোষ ঝিল্লি (Cell/plasma membrane): কোষ ঝিল্লি কোষকে নিরাপদ রাখার কাজটি করে। তাই এটি হচ্ছে কোষকে ঘিরে থাকা দুটো স্তরবিশিষ্ট একটি নমনীয় (Flexible) আবরণ বা পর্দা (ঝিল্লি) যা বাইরের পরিবেশ থেকে কোষের ভিতরের উপাদানগুলোকে আলাদা রাখে। এটি মূলত লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। প্রাণীকোষে যেহেতু কোষপ্রাচীর থাকে না, তাই কোষঝিল্লিই হচ্ছে প্রাণীকোষের সবচেয়ে বাইরের স্তর। অপরদিকে যেসব কোষে কোষপ্রাচীর থাকে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এই ঝিল্লি বা পর্দা কোষপ্রাচীরের ঠিক নিচেই অবস্থান করে। কোষ ঝিল্লির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো ভেদ করে সব উপাদান কোষের ভেতর থেকে বাইরে যেতে পারে না, বা বাইরে থেকে ভেতরে আসতে পারে না। বরং কেবল নির্দিষ্ট কিছু উপাদান এই পর্দা ভেদ করে কোষের বাইরে থেকে কোষের ভেতরে যাতায়াত করতে পারে।

(গ) প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm): কোষ প্রাচীর এবং ঝিল্লি দ্বারা ঘিরে থাকা কোষের যে স্বচ্ছ, ঘন ও জেলির মতো বস্তু দেখা যায়, তাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজমে শতকরা ৭৫ থেকে ৯৫ ভাগ পানি। কোষের সমস্ত জৈব-রাসায়নিক (Biochemical) কাজ প্রোটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়। প্রোটোপ্লাজমকে প্রধানত দুই অংশে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে ১। নিউক্লিয়াস এবং ২। সাইটোপ্লাজম।

তোমরা যারা 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে রূপকথা পড়েছ, সেখানে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে, গল্পের দৈত্যটিকে বধ করা খুব কঠিন। কারণ, তার প্রাণ লুকানো থাকে গভীর এক তালপুকুরের মাঝখানে ছোট্ট একটি কৌটার মধ্যে রাখা এক ভোমরার ভেতরে। গল্পের তালপুকুর আর তার মাঝখানের কৌটার কথাটা মনে রেখে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসের পরিচয়টা খুব সহজেই বুঝে নেওয়া যায়।

আমরা যদি কোষের প্রোটোপ্লাজমকে গল্পের তালপুকুর মনে করি, তবে পুকুরের মাঝখানের কৌটাটা হচ্ছে কোষের নিউক্লিয়াস, আর পুকুরের পানি হচ্ছে কোষের সাইটোপ্লাজম। শুধু তাই নয় নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে ক্রোমোজম থাকে, সেটাকে তুলনা করা যায় প্রাণভোমরার সঙ্গে। লক্ষ করে দেখো, কৌটাটা পুকুরের ভেতর থাকলেও তার কিন্তু নিজস্ব সীমা আছে, আবরণ আছে। কোষের নিউক্লিয়াসের বেলায়ও তাই। সেটিরও নিজস্ব আবরণ আছে যা সেটিকে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে রাখে। এবার আমরা রূপকথার বাইরে গিয়ে আরো একটু বিস্তারিতভাবে এই গঠন বৈশিষ্ট্য জানব।

১। নিউক্লিয়াস (Nucleus): বিভিন্ন কোষের প্রোটোপ্লাজম-এ অবস্থিত দ্বি-স্তরবিশিষ্ট ঝিল্লি দিয়ে ঘিরে রাখা ঘন, অস্বচ্ছ অঙ্গাণুটি হলো নিউক্লিয়াস। সকল জীবের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। যেসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত থাকে, তাকে প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) বলে। প্রকৃত কোষ দুই প্রকার, যথা: দেহকোষ এবং জনন কোষ। অপরদিকে যেসব কোষে নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে না, সেগুলোকে আদি কোষ (Prokaryotic cell) বলে। যেমন, ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এক ধরনের আদিকোষ।

রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) (১৮৩১) অর্কিডের পাতার কোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার এবং নামকরণ করেন। প্রতিটি কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। তবে কোনো কোনো শৈবাল এবং ছত্রাকের একেকটি কোষে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াস প্রধানত কোষের কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং বিভিন্ন কোষভেদে নিউক্লিয়াস সাধারণত গোলাকার, উপবৃত্তাকার বা নলাকার হয়ে থাকে।

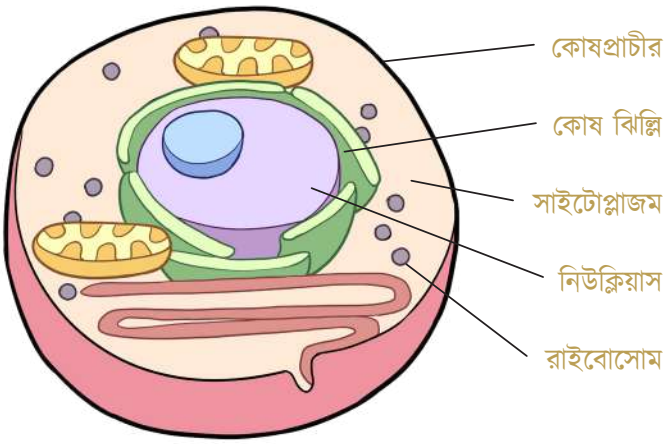

কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের সুরক্ষিত অবস্থান। নিউক্লিয়াসের নিজস্ব পর্দা আছে যা তাকে সাইটোপ্লাজমের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক রাখে।

নিউক্লিয়াস কোষের সব ধরনের কার্য-কলাপের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। নিউক্লিয়াসের ভেতরে ক্রোমোজম (Chromosome) নামে একটি বিশেষ বস্তু অবস্থান করে (অনেকটা উপরের গল্পের প্রাণভোমরার মতো), যা জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এই ক্রোমোজমে আসলে জীবের বংশগতি পদার্থ ডিএনএ (DNA: Deoxyribonucleic acid বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড)-এ ধারণ করে। ডিএনএ তথা ক্রোমোজমের যদি কোনো ক্ষতি হয়, তবে তা জীবের জন্যও ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। তাই ডিএনএ কে সুরক্ষা দেবার জন্যই নিউক্লিয়াসের ভেতর তার অবস্থান। ডিএনএর গঠন ও কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে মাতা-পিতার জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

২। সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm): কোষের নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষ ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশের নাম সাইটোপ্লাজম। এটি প্রধানত প্রোটিন দ্বারা গঠিত। সাইটোপ্লাজম কিন্তু কোনো ফাঁকা স্থান নয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এই সাইটোপ্লাজমে বেশ কয়েক রকমের অঙ্গাণু দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম (Ribosome), গলজি বডি (Golgi body), আন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা (Endoplasmic reticulum), কোষ গহবর (Vacuole), লাইসোসোম (Lysosome) ইত্যাদি। এছাড়া উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিড (Plastid) এবং প্রাণী কোষে সেন্ট্রোসোম (Centrosome) ও সেন্ট্রিয়োল (Centrioles) থাকে।

সাইটোপ্লাজম কোষের এসব অঙ্গাণু ধারণ করে। এছাড়া কোষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যেমন- শক্তি উৎপাদন, জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ, পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতা

ইত্যাদি সম্পন্ন হয় সাইটোপ্লাজমে। যে কোনো জীবের দেহে সংঘটিত সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াকে একত্রে বিপাক (Metabolism) বলে। বিপাক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কোষে নির্দিষ্ট মাত্রার অম্লত্ব বা ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখতে হয়। সাইটোপ্লাজম কোষের অম্লীয় বা ক্ষারীয় অবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করে।

আগেই বলা হয়েছে, সাইটোপ্লাজমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু অবস্থান করে। তবে এই শ্রেণিতে আমরা সেগুলোর সবার পরিচয় বিস্তারিত জানব না। কেবল দুটো অঙ্গাণু- মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। বাকি অঙ্গাণুগুলো নিয়ে আমরা উপরের শ্রেণিতে জানব।

আমরা অনেক সময় গাছের যে অনুভূতি আছে বা গাছ যে সংবেদনশীল তা প্রমাণে লজ্জাবতীর পাতা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করি। এর কারণ কি জানো? এর পেছনে কোষ গহ্বর (Vacoule) এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। লজ্জাবতী পাতার গোড়ায় অনেক কোষ থাকে। ওই সব কোষের কোষ গহ্বর পানি ভর্তি থাকে। পানিভর্তি হওয়ার কারণে লজ্জাবতী গাছের পাতার ডাঁটা সোজা হয়। কিন্তু হঠাৎ পাতা ছুঁলে কোষ থেকে পানি বেরিয়ে যায়। ফলে ফোলা কোষগুলো চুপসে যায় এবং লজ্জাবতী পাতার ডাঁটা নিচের দিকে নুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সব পাতার কোষে এই প্রভাব পড়ে এবং এভাবে সব পাতা নুয়ে যায়।

মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria):

এটি কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু যেখানে শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের কয়েকটি ধাপ সম্পন্ন হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোষের ভেতর থাকা গ্লুকোজ অণু ভেঙে জীবের ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তোমরা এই বইয়ের জৈব শক্তি অধ্যায়ে আরো বেশি জানতে পারবে। মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তি উৎপাদনে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে একে কোষের শক্তিঘর (Powerhouse) বলা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী- উভয় কোষেই মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে।

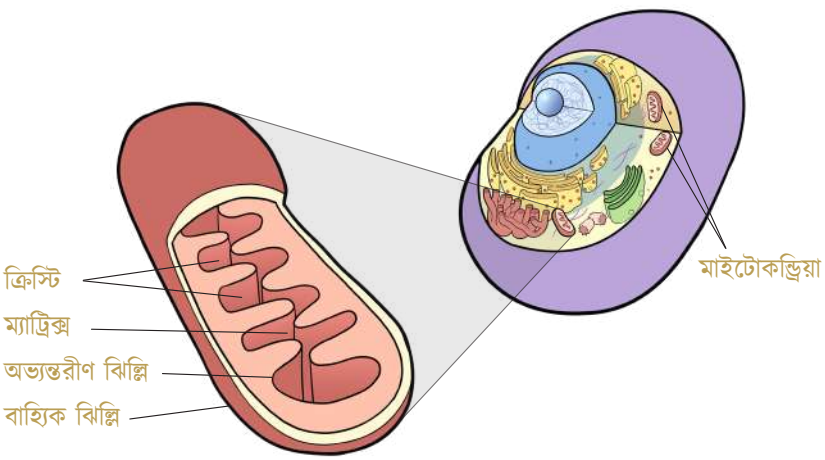

কোষের ভেতর একটি মাইটোকন্ড্রিয়া। এতে ম্যাট্রিক্স, ঝিল্লি ইত্যাদির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়া দুই স্তরবিশিষ্ট আবরণ বা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এই ঝিল্লিটি প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে তৈরি। মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লির বাইরের আবরণটি মসৃণ, কিন্তু ভেতরের আবরণটি স্থানে স্থানে ভাঁজ হয়ে ভেতরের দিকে ঝুলে থাকে। এ ভাঁজগুলোকে ক্রিস্টি (Cristae) বলা হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরের অর্ধতরল দানাদার পদার্থকে ম্যাট্রিক্স (Matrix) বলা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব ডিএনএ আছে, যা সেগুলোর ম্যাট্রিক্স-এ অবস্থান করে। একটি কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে। কার্ল বেন্ডা (Carl Benda) ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন।

প্লাস্টিড (Plastid): প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ক্ষুদ্র, দানাদার বিভিন্ন আকারের প্লাস্টিড পাওয়া যায়। এর উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদের পাতা, ফুল ও ফলে বিচিত্র রং দেখা যায়। উদ্ভিদ কোষে সাধারণত তিন প্রকার প্লাস্টিড থাকে। যথা- ক্রোমোপ্লাস্ট, ক্লোরোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট। সবুজ ছাড়া অন্যান্য বর্ণ যেমন লাল, হলুদ ইত্যাদি বর্ণ বহনকারী প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) বলা হয়। ফুলের পাপড়িতে ও ফলে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। এজন্য ফুল ও ফল বিভিন্ন বর্ণের দেখা যায় ক্রোমোপ্লাস্টের উপস্থিতির কারণে। উদ্ভিদে বর্ণহীন যেসব প্লাস্টিড থাকে, সেগুলোকে বলা হয় লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast)। উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশ, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড, মূল প্রভৃতিতে লিউকোপ্লাস্ট থাকে। এরা খাদ্য সঞ্চয় করে।

বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিড

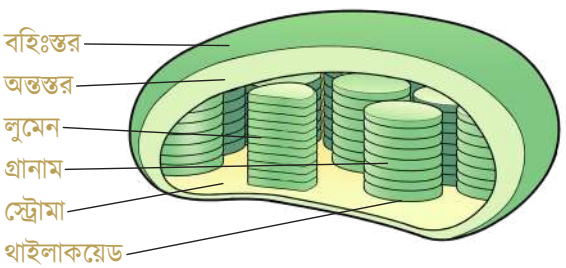

ক্লোরোপ্লাস্টের বিস্তারিত গঠন

উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লাস্টিড হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামের অণু থাকে বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদের পাতা ও কচি শাখা প্রশাখা সবুজ দেখায়। মানুষসহ জীবজগতের বেশির ভাগ সদস্য সেগুলোর শক্তির জোগান পায় যে প্রক্রিয়া থেকে, সেই সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় ক্লোরোপ্লাস্টে। এজন্য কোষের সকল অঙ্গাণু মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট একটি বিশেষ অবস্থান অধিকার করে আছে। কেবল উদ্ভিদ কোষেই ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, প্রাণীকোষে থাকে না।

কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার মতো ক্লোরোপ্লাস্টেরও নিজস্ব ডিএনএ আছে। সুতরাং যদি প্রশ্ন হয়, নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের আর কোন কোন অঙ্গাণুতে ডিএনএ থাকে, তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের নাম আসবে। বিজ্ঞানীরা ফসলের ফলন বৃদ্ধি, রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য নিউক্লিয়াসের পাশাপাশি মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের ডিএনএ নিয়েও অনেক গবেষণা করছেন এখন।

কোষের বিভাজন ও সংখ্যাবৃদ্ধি

জীবের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য তার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি দরকার। কোষ সংখ্যায় বাড়ে বিভাজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি হয়, দুটি থেকে চারটি হয় ইত্যাদি। জীবের দেহ গঠনের জন্য দরকার দেহকোষ (Somatic cell)। অপরদিকে তার প্রজননের জন্য দরকার হয় প্রজনন কোষ (Reproductive cell)। উচ্চশ্রেণির জীবে, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে দেহকোষ বিভাজিত হয় যে প্রক্রিয়ায়, তাকে বলা হয় মাইটোসিস (Mitosis) কোষ বিভাজন। অপরদিকে প্রজনন কোষ তৈরি হবার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় মায়োসিস (Meiosis) কোষ বিভাজন।

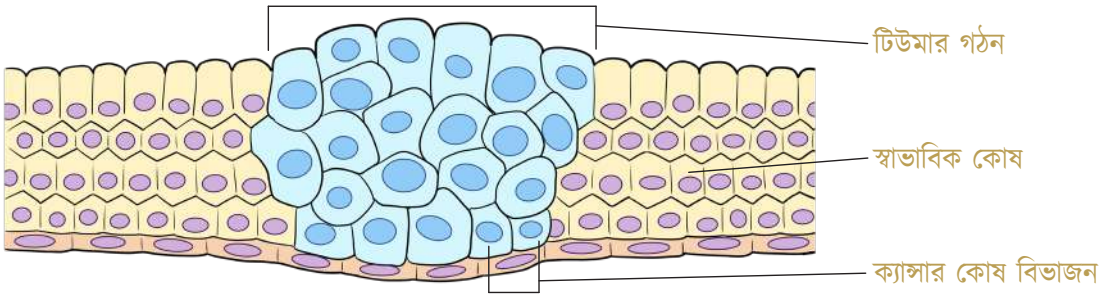

কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের পরিণতি

কোষ বিভাজন অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া। যেকোনো জীব চায় তার কোষের সংখ্যা যেন অনিয়ন্ত্রিতভাবে না বাড়ে। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, গুণগত দিক থেকেও কোষগুলো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের হওয়া জরুরি। যদি কোনো কোষ অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে, তবে তা জীবের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এরকম ক্ষতিকর পরিণতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে ক্যান্সার। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষ বিভাজন হয়। সংখ্যাবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোষগুলোর মৃত্যু হয়। এভাবে জীবের কোষের সংখ্যার একটি ভারসাম্য রক্ষা হয়। কিন্তু যদি কোনো কারণে কোষের মৃত্যু না হয়, অথচ নতুন নতুন কোষ তৈরি হতেই থাকে, তবে শরীরে টিউমার হতে পারে, যা এক পর্যায়ে ক্যান্সারের রূপ গ্রহণ করে।

আমরা মায়োসিস প্রক্রিয়ায় জনন কোষ তৈরি হবার বিষয়টি উপরে জেনেছি। জননকোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকা দরকার। যদি কোনো কোষে স্বাভাবিকতার চেয়ে বেশি বা কম ক্রোমোসম থাকে, তবে এসব জনন কোষ থেকে অস্বাভাবিক বৈশিস্ট্যসম্পন্ন সন্তান জন্ম নেবে। উপসর্গগুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে যেমন ভাষা প্রকাশে অসুবিধা, বসা এবং হাঁটার সমস্যা এবং আচরণগত-আবেগজনিত সমস্যা। আশপাশে যাদের এরকম সমস্যা আছে তুমি ও তোমার বন্ধুরা তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করে তোমাদের এলাকায় একটি পরিবর্তন আনতে পারো।

এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জীবের স্বাভাবিক প্রজনন ও বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক কোষ বিভাজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুশীলনী ?

১। একটা উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের মাঝে কোন পার্থক্যটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ মনে হয়? কেন?

২। আমাদের শরীরে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোষের মৃত্যু হয়। সময় মতো মৃত্যু না হলে আমাদের কী সমস্যা হতে পারে? এই ছন্দপতন কেন হয় এবং তা ঠেকানোর জন্য আমাদের কী করণীয় ?

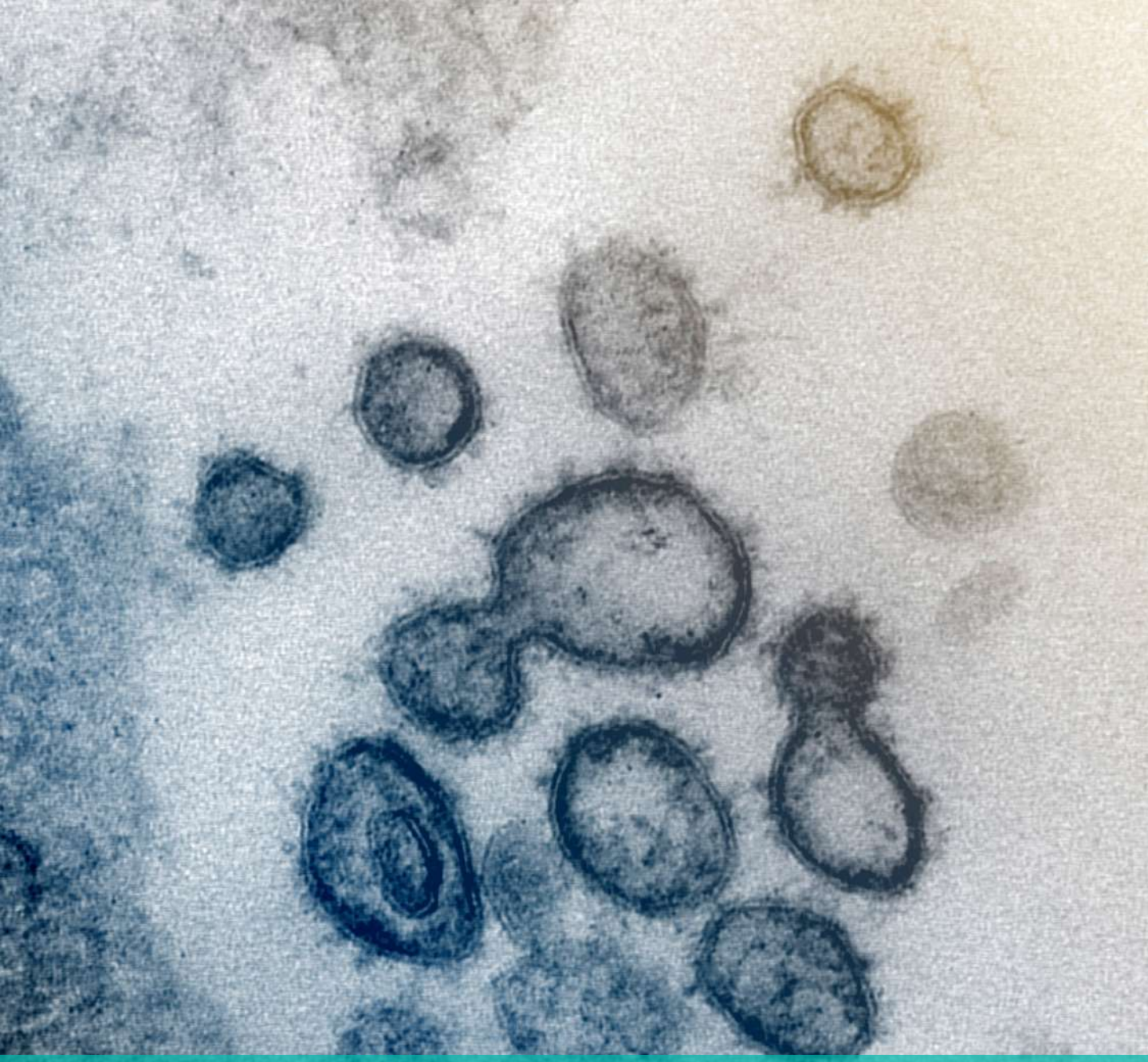

অধ্যায় ৫

অণুজীবজগৎ

অধ্যায় ৫ অণুজীবজগৎ

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ অণুজীব, অণুজীবজগতের শ্রেণিবিভাগ
- ☑ কিছু সাধারণ অণুজীবের পরিচয়
- ☑ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া
- ☑ ছত্রাক, শৈবাল ও অ্যামিবা
- ☑ জীবের ভেতর বসত করা অণুজীব

প্রথমেই একটি মজার খাবারের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। তোমরা নিশ্চয়ই দই (Yogurt) খেয়েছ, যে কোনো বড় মুদি দোকান কিংবা মিষ্টির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেও দেখবে তাদের কাছে দই আছে। ঘরেও আমাদের অনেকের মা-বাবা কিংবা বড় ভাই-বোনেরা দই বানাতে পারে। কীভাবে দই তৈরি করা হয় জানো? যারা দই তৈরি করেন, তারা হয়তো বলবেন, দুধ থেকে দই তৈরি হয়। তাদের কথায় ভুল নেই। কিন্তু দুধ থেকে দই তৈরির পেছনে কিন্তু অদৃশ্য কারিগরও আছে, যেগুলোকে আমরা দেখতে পাই না। সেগুলো তরল দুধকে পরিবর্তন করে দই বানিয়ে ফেলে। এই অদৃশ্য কারিগর আর কেউ নয়, এক (বা একাধিক) ধরনের অণুজীব। এই অধ্যায়ে আমাদের খালি চোখে দেখা যায় না যে বিস্ময়কর অণুজীবজগৎ, সে সম্বন্ধে জানব।

আমাদের চারপাশে আমরা ছোট-বড় অনেক জীব দেখতে পাই। এগুলোর কেউ উদ্ভিদ, কেউ প্রাণী। এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায়। এগুলোর বাইরে জীবগতের যে অংশকে আমরা খালি চোখে দেখি না, তবে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে দেখা যায়, তা-ই অণুজীবজগৎ। আমাদের চারপাশের সর্বত্র এই অণুজীবজগতের বিস্তার। ঘরের বা স্কুলের আঙিনার সামান্য একটু মাটিতেও থাকতে পারে লক্ষ লক্ষ অণুজীব, যা কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রেই দেখা যাবে। এগুলো যে কেবল আকারে ছোট তা-ই নয়, বরং এসব অণুজীবের গঠনও ভিন্ন। অনেক অণুজীব কেবল এককোষী, অর্থাৎ কেবল একটি কোষ নিয়েই গঠিত। কিন্তু কিছু অণুজীব বহুকোষ বিশিষ্ট হতে পারে। কিছু অণুজীবে নির্দিষ্ট কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াসযুক্ত সুগঠিত কোষও থাকে না। নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত জানব তবে এখন জেনে রাখি যে, নিউক্লিয়াস কোষের সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে ।

অণুজীব তুলনামূলকভাবে সরল গঠনের হয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, বিবর্তনের ধারায় (জটিল জীবের তুলনায়) আগে পৃথিবীতে এসব অণুজীবের উদ্ভব হয়েছে। তাই অণুজীবকে আদিজীবও বলা হয়ে থাকে। আমরা আগের শ্রেণিতে অণুজীবজগতের সদস্যদের কথা খানিকটা পড়েছি। সেখানে আমরা

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, এগুলোর কথা জেনেছি। এগুলো সব এক ধরনের অণুজীব। আমরা আরো বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে অণুজীব নিয়ে জানব।

অণুজীবজগতের শ্রেণিবিভাগ

অণুজীবজগতের শ্রেণিবিভাগ করার সময়ে এগুলোর আকার এবং এগুলোর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব বিবেচনায় অণুজীবজগৎকে মূলত তিনটি রাজ্যে ভাগ করা হয়। ভাগগুলো হচ্ছে,

রাজ্য-১: এক্যারিওটা বা অকোষীয়। এসব অণুজীব এতটাই ছোট যে, সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচেও এগুলোকে দেখা যায় না। এগুলো দেখতে বিশেষ অণুবীক্ষণ যন্ত্র যা দিয়ে অতীব ক্ষুদ্র জিনিস দেখা যায় (Electron microscope) তার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ: ভাইরাস।

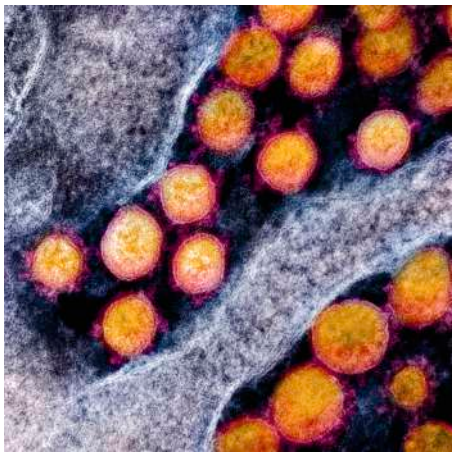

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা SARS-CoV-2 ভাইরাস, যা করোনাভাইরাস নামেই বহুল পরিচিত

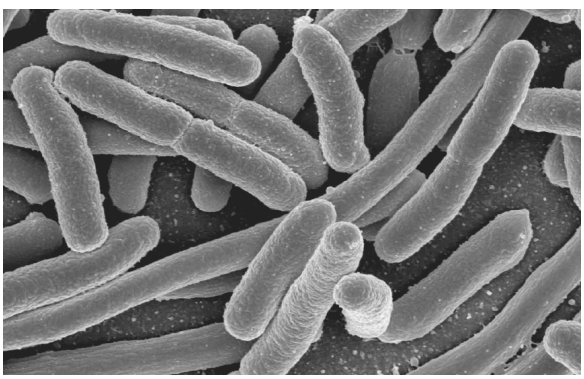

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা *E. coli* নামক ব্যাকটেরিয়া

রাজ্য-২: প্রোক্যারিওটা বা আদিকোষী। যেসব অণুজীবের কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা সুগঠিত নয়, সেগুলোই এ রাজ্যের সদস্য। সুগঠিত কেন্দ্রিকা না থাকায় এগুলোর কোষকে আদিকোষ বলা হয়। উদাহরণ: ব্যাকটেরিয়া।

রাজ্য-৩: ইউক্যারিওটা বা প্রকৃতকোষী। যেসব অণুজীব কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা সুগঠিত, সেগুলোকে প্রকৃত কোষ বলে। উদাহরণ: শৈবাল, ছত্রাক ও প্রোটোজোয়া এ ধরনের অণুজীব।

মাইক্রোস্কোপে দেখা ইস্ট, বেকিংসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয় এই অণুজীব

কিছু সাধারণ অণুজীবের পরিচয়

ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি ধরনের অণুজীব আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো অধিকাংশই আমাদের উপকার করে। তবে কিছু কিছু অণুজীব আছে, যেগুলো আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। এবার আমরা কয়েকটি অণুজীব সম্পর্কে জানব।

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

ভাইরাস

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ভাইরাসকে দেখা যায় না। ভাইরাসকে অণুজীব হিসেবে বিবেচনা করলেও এগুলোর আসলে স্বাধীন জীবন নেই। পরিবেশে এগুলো থাকে নির্জীব কণা হিসেবে। কিন্তু অন্য কোনো জীবের কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাস জীবের মতো আচরণ করতে পারে। ভাইরাসের দেহে কোষপ্রাচীর, সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ইত্যাদি কিছুই নেই। তাই ভাইরাস দেহকে অকোষীয়ও বলা হয়। এগুলো শুধু আমিষ (প্রোটিন) আবরণ ও নিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ বা আরএনএ) নিয়ে গঠিত। এগুলোর আমিষ আবরণ থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড বের হয়ে গেলে এগুলো জীবনের সকল লক্ষণ হারিয়ে ফেলে। তবে অন্য জীবকোষে প্রবেশের পর যখনই সেগুলো প্রোটিন আবরণ ও নিউক্লিক অ্যাসিডকে একত্র করতে পারে, তখন এগুলো জীবনের সব লক্ষণ ফিরে পায়। অর্থাৎ জীবিত জীবদেহ ছাড়া বা জীবদেহের বাইরে এগুলো জীবনের কোনো লক্ষণ দেখায় না। এ কারণে ভাইরাস প্রকৃত পরজীবী।

ভাইরাসের মধ্যে ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস একটি পরিচিত ভাইরাস। যেসব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে, সেগুলোই হলো ব্যাকটেরিওফাজ। এগুলো ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশের পর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে। চিত্রে এগুলোর গঠন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

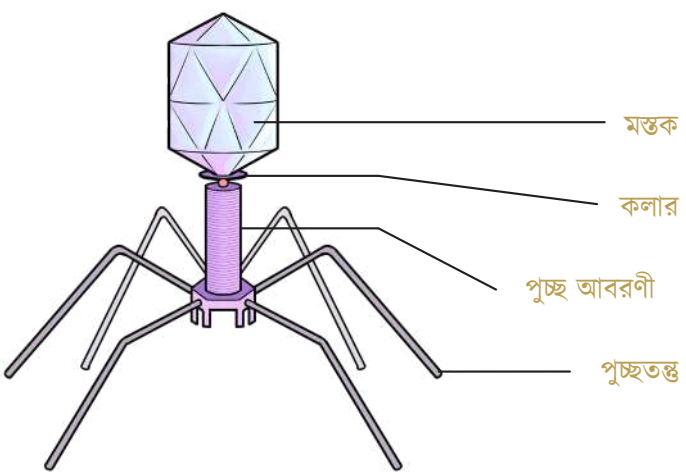

একটি সাধারণ ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস

ভাইরাস গোলাকার, দণ্ডাকার, ব্যাঙাচির মতো ইত্যাদি আকৃতির হতে পারে। তবে ভাইরাসবাহিত রোগ বলতেই এই মুহূর্তে সবার আগে যে রোগটির কথা চলে আসে তা হলো কোভিড-১৯, যা প্রচলিত ভাষায় 'করোনা' নামেই পরিচিত। করোনাভাইরাস আবার বিভিন্ন ধরনের হয়, এরকম একটি ধরণ হলো SARS-CoV-2 যা মূলত কোভিড-১৯ রোগের জন্য দায়ী। কোভিড-১৯ হলে কী ধরনের উপসর্গ হয় তোমরা সবাই ইতোমধ্যে জানো। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়ায় এই রোগ, আক্রান্ত রোগীর সাধারণ সর্দিকাশি

থেকে শুরু করে ফুসফুসের জটিলতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি গত কয়েক বছরে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে এই বিশেষ ধরনের করোনাভাইরাস।

ভাইরাস শুধু মানুষের জন্যেই বিপদ ডেকে আনে, তা নয়। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও উদ্ভিদের অনেক রোগের জন্যেও দায়ী বিভিন্ন ভাইরাস; যেমন- ধানের টুংরো ও তামাকের মোজায়েক রোগ ভাইরাসের কারণে হয়।

এপর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে যে প্রকৃতিতে শুধুই রোগ দুর্ভোগ ডেকে আনা ছাড়া ভাইরাসের আর কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু কথাটা সত্য নয়, বরং প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য সব জীবের মতো ভাইরাসেরও প্রয়োজন। সত্যি বলতে পৃথিবীতে বাস করা অসংখ্য ভাইরাসের মধ্যে খুব কম ভাইরাসই আমাদের রোগের কারণ ঘটায়।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়ার কিছু কথা আমরা আগের শ্রেণিতে জেনেছি। এবার একটু বিস্তারিত জানব। ব্যাকটেরিয়া হলো আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত, অসবুজ, এককোষী অণুবীক্ষণিক জীব (অর্থাৎ এগুলোর অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না)। বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ফন লিউয়েন হুক সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়া দেখতে পান। ব্যাকটেরিয়া কোষ গোলাকার, দণ্ডাকার, কমা আকার, প্যাঁচানো ইত্যাদি ধরনের হতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার আকার-আকৃতির ভিত্তিতে এগুলোকে নিম্নরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়:

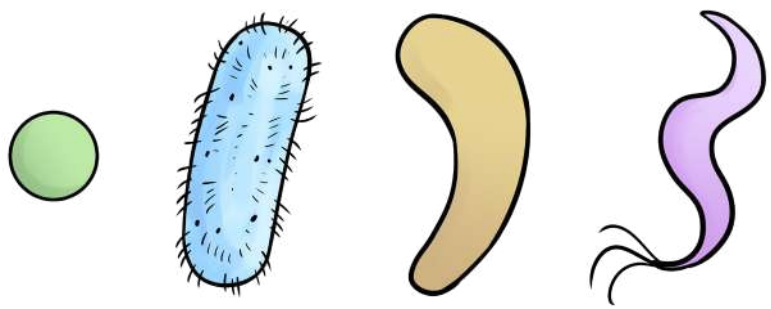

বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটেরিয়া

ক) কক্কাস (Coccus): কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি গোলাকার। এগুলো কক্কাস ব্যাকটেরিয়া। এগুলো এককভাবে অথবা দল বেঁধে থাকতে পারে, যেমন- নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, যেগুলোকে নিউমোকক্কাস বলা হয়।

খ) ব্যাসিলাস (Bacillus): এরা দেখতে লম্বা দণ্ডের ন্যায়। ধনুষ্টংকার, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি রোগ এরা সৃষ্টি করে।

গ) কমা (Comma): এগুলো বাকা দণ্ডের মতো আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। মানুষের কলেরা রোগের ব্যাকটেরিয়া এ ধরনের।

ঘ) স্পাইরিলাম (Spirillum): এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি প্যাঁচানো। ইঁদুরের কামড় থেকে অনেক সময় এ ধরনের ব্যাকেটেরিয়া আমাদের শরীরে ঢুকে জ্বরসহ বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি করে।

ব্যাকেরিয়া সরল আণুবীক্ষণিক জীব হলেও সেগুলোর কিন্তু একটি সুগঠিত কোষীয় গঠন রয়েছে। এসব কোষের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রকৃতকোষী বা অকোষীয় অন্য জীবে পাওয়া যাবে না।

ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী জীব। এর অর্থ, এসব কোষের নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কেন্দ্রিকা সুগঠিত নয়। কোষবিজ্ঞান অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসের নিজস্ব পর্দা থাকে, যা নিউক্লিয়াসটিকে কোষের অন্য অংশ থেকে পৃথক করে রাখে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। সেগুলোর মূল নিউক্লিয়ার বস্তু তথা ডিএনএ (DNA) কোষের প্রোটোপ্লাজমে অবস্থান করে। এগুলোকে নিউক্লিয়েড (Nucleoid) বলা হয়।

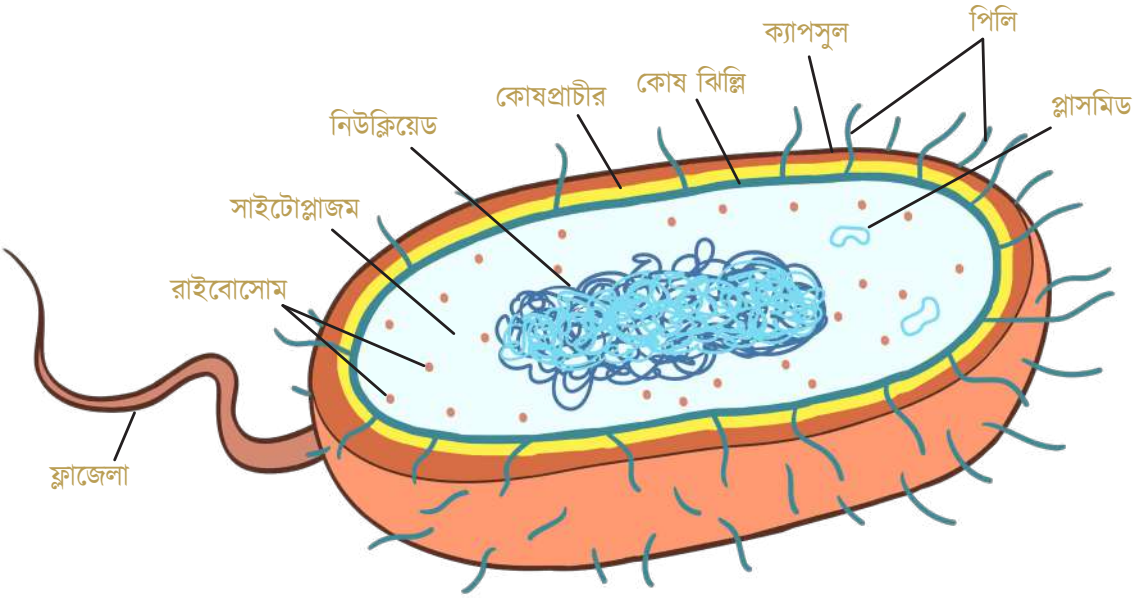

ব্যাকটেরিয়ার কোষীয় গঠনের একটি সাধারণ চিত্র।

আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়ার কোষে সেগুলোর মূল নিউক্লিয়ার বস্তু ছাড়াও বৃত্তাকার এক বা একাধিক ডিএনএ দিয়ে তৈরি গঠন থাকে। এগুলোকে বলা হয় প্লাসমিড (Plasmid)। আমরা জেনেছি যে নিউক্লিয়াস কোষের সব ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সে করে ডিএনএ-এর মাধ্যমে। ডিএনএর মধ্যে তো সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার অনেক তথ্য, আলাদা আলাদা তথ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিএনএর আলাদা আলাদা যে অংশ কাজ করে সেগুলোকে জিন বলে। প্লাসমিডের মধ্যেও কিছু জিন থাকে। উপরের ক্লাসে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব, আপাতত জেনে রেখো যে জিন ডিএনএ একটি অংশ যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

প্লাসমিডে অবস্থিত জিন থেকে এমন কিছু প্রোটিন তৈরি হয়, যেগুলো ব্যাকটেরিয়াকে নানান বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতা প্রদান করে। যেমন ব্যাকটেরিয়ার শত্রু হচ্ছে ভাইরাস। প্লাসমিডে থাকা জিন ভাইরাসের মতো

শত্রুর মোকাবেলা করে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য আমরা যেসব ওষুধ ব্যবহার করি, সেগুলোর বিরুদ্ধেও প্লাসমিড ভূমিকা রাখে।

তোমরা হয়তো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic engineering)-নামে জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার নাম শুনে থাকবে। জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে যে জিন, সেগুলোর ভেতরে পরিবর্তন এনে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব তৈরির বিষয়টি বিজ্ঞানীদের জন্য সম্ভব করেছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিকাশে প্লাসমিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ডিএনএ ছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতর অন্যান্য জীবকোষের মতোই মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম, গলজি বডি, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে।

ব্যাকটেরিয়ায় কোষপ্রাচীর থাকে। তবে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য কিছু ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের উপরে আরো একটি আবরণ থাক। একে ক্যাপসুল (Capsule) বলা হয়। ক্যাপসুল মূলত শর্করা (Polysaccharide)-র আবরণ, যা সহজে ভেদ করা যায় না। যেসব ব্যাকটেরিয়ায় ক্যাপসুল আবরণ থাকে, সেগুলোর সংক্রমণে আমাদের অসুখ বিসুখ হলে এর চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়। কারণ, আমরা যেসব ওষুধ খাই, তাকে ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতর ঢুকতে বাধা দেয় এই ক্যাপসুল আবরণ।

ব্যাকটেরিয়ার চলাচল সহযোগিতা করার জন্য কোষপ্রাচীরের সঙ্গে ফ্লাজেলা (Flagella) নামের সুতার মতো অসংখ্য বিস্তারণ (Extension) থাকে। এগুলোর নড়াচড়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জলীয় পরিবেশে চলাচল করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা

ব্যাকটেরিয়া আমাদের অনেক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে, এটা সত্যি। কিন্তু সেগুলোর অনেক উপকারী ভূমিকাও আছে। যেমন:

- বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic) ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়।
- একমাত্র ব্যাকটেরিয়াই প্রকৃতি থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Nitrogen fixation) করে। পরিবেশের নাইট্রোজেন সাধারণত নিষ্ক্রিয় থাকে, সহজে কোনো যৌগ গঠনে অংশ নেয় না। সংবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নাইট্রোজেন অণুকে বিক্রিয়াযোগ্য করে তোলে। এর ফলে মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে।
- দই তৈরি করতে ও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিতে হয়।

ছত্রাক, শৈবাল ও অ্যামিবা

ছত্রাক

ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন অসবুজ জীব। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ক্লোরোফিল একটি অতি প্রয়োজনীয় জৈব অণু যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উদ্ভিদকে সূর্যালোক থেকে

শক্তি সংগ্রহে সাহায্য করে। এক সময়ে ছত্রাককে অসবুজ উদ্ভিদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে উদ্ভিদ থেকে আলাদা বিবেচনা করা হয়। ক্লোরোফিলের অভাবে এগুলো সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। তাই অন্য জীব বা জীবের অংশবিশেষের ওপর নির্ভর করে খাদ্যগ্রহণ করে (পরভোজী বৈশিষ্ট্য) অথবা মৃতজীবের অবশিষ্ট জৈববস্তু থেকে সেগুলো পুষ্টি গ্রহণ করে (মৃতজীবী বৈশিষ্ট্য)। পরভোজী ছত্রাক বাসি ও পচা খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল, শাকসবজি, ভেঁজা রুটি বা চামড়া, গোবর ইত্যাদিতে জন্মায়। মৃতভোজী ছত্রাক মৃত জীবদেহে বা জৈব পদার্থসমৃদ্ধ মাটিতে জন্মায়।

ঈস্ট এগারিকাস

ছত্রাকের আকার আণুবীক্ষণিক কিংবা বৃহৎ হতে পারে। রুটি ফোলানোর কাজে ব্যবহার করা ঈস্ট কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত এগারিকাস বেশ বড় হয় এবং আমরা সেগুলোকে সহজেই দেখতে পাই।

ছত্রাকে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এগুলোর কোষপ্রাচীরে কাইটিন নামের বিশেষ উপাদান থাকে যা সেগুলোকে বাইরের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে বা অন্য জীবাণুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

ছত্রাকের উপকারিতা

ছত্রাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অণুজীব। পেনিসিলিন (Penicillin) নামের অ্যান্টিবায়োটিকের নাম হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে। অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে এমন ওষুধ যা সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নামের একজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন পেনিসিলিয়াম (Penicillium) নামের এক ধরনের ছত্রাক থেকে।

পাঁউরুটি তৈরিতে ঈস্ট (Yeast) নামের ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঈস্ট দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে যে শ্বাসক্রিয়া হয়, তার থেকে সৃষ্ট প্রচুর পরিমাণের কার্বন ডাইঅক্সাইডের বুদবুদ আটার খামিরে ভরে যায়, তাই খামিরের আয়তন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ খামির ফুলে যায়। তাই আমরা যে পাউরুটি খাই তা যথেষ্ট নরম হয়। ঈস্ট ভিটামিনসমৃদ্ধ বলে ট্যাবলেট হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এগারিকাস (Agaricus) নামক এক ধরনের মাশরুম মজাদার খাদ্য বলে বিবেচিত। বর্তমানে আমাদের দেশসহ বহু দেশে এর চাষ করা হয়। আবর্জনা পচিয়ে মাটিতে মিশিয়ে জৈব সার তৈরিতেও ছত্রাকের বড় ভূমিকা রয়েছে।

ছত্রাকের অপকারিতা

অনেক রকমের ছত্রাক রয়েছে যেগুলো মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অনেক রোগের জন্য দায়ী। দাদ, ছুলি (ছোলম) ও মানুষের শ্বাসনালির সংক্রমণে ছত্রাকের ভূমিকা থাকে। ছত্রাক আলু, পাট, আখ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া এ ছত্রাক সহজেই কাঠ ও বেত বা বাঁশের আসবাবপত্র পচিয়ে ফেলে।

ছত্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধকরণ

ছত্রাকজনিত রোগ খুবই ছোঁয়াচে। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এসব রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে যা করা দরকার তা হলো:

- ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র (কাপড় চোপড়, চিরুনি, টুপি, স্যান্ডেল) ব্যবহার না করা।
- ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কম আসা।
- ছত্রাক আক্রান্ত উদ্ভিদে ওষুধ ছিটানো বা উদ্ভিদ তুলে পুড়িয়ে ফেলা।

শৈবাল

ক্লোরোফিলযুক্ত ও স্ব-ভোজী উদ্ভিদসদৃশ জীব হচ্ছে শৈবাল। শৈবালকে পুরোপুরি উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য করা যায় না, কারণ, সেগুলোর মূল, কাণ্ড ইত্যাদি পুরোপুরি উদ্ভিদের মতো নয়। এরা মাটি, পানি ও অন্য গাছের উপর জন্মায়। সবুজ ও লাল, বাদামি ইত্যাদি রঙের শৈবাল দেখা যায়। আকার আকৃতির দিক থেকে শৈবালের বৈচিত্র্য অবাক করার মতো। কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া

দৈত্যাকার কেল্প যা সমুদ্রে জন্মায়।

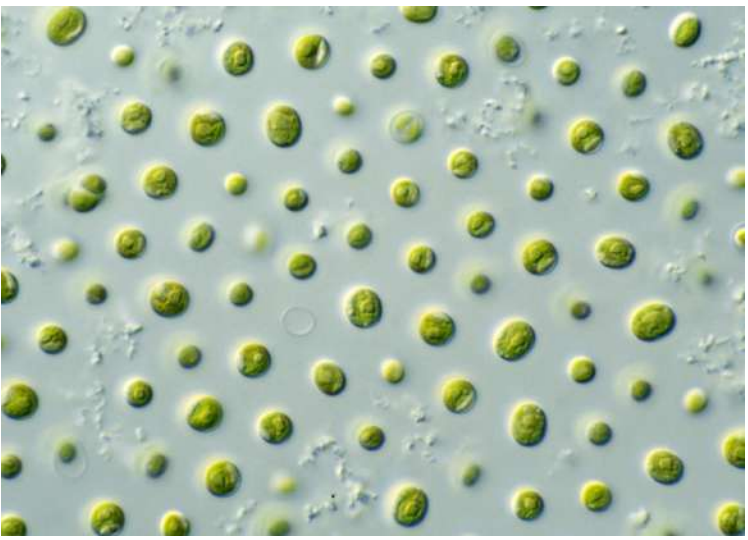

কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখা যায় এমন ক্ষুদ্র শৈবাল।

দেখা যায় না এমন শৈবাল যেমন রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় Microalgae বা ক্ষুদ্র শৈবাল। অপরদিকে অনেক বৃহৎ শৈবাল রয়েছে যেগুলো সমুদ্রে জন্মায় এবং গড়ে ১০০ ফুটের মতো লম্বা হয়। এগুলোকে কেল্প (Kelp) বলা হয়।

শৈবালের গঠন: শৈবাল এককোষী কিংবা বহুকোষী হতে পারে। অনেকগুলো কোষ মিলে এগুলো শিকলের মতো গঠন নিতে পারে। প্রায় উদ্ভিদের মতো দেখতে অনেক বড় শৈবালও রয়েছে। শৈবালের কোষে কোষপ্রাচীর থাকে।

এছাড়া এগুলোর নিউক্লিয়াস সুগঠিত। অর্থাৎ এগুলোর নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা নিউক্লিয়াসটি কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক থাকে। শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মাইটোকন্ড্রিয়া অঙ্গাণুও থাকে।

শৈবালের উপকারিতা: শৈবাল অত্যন্ত উপকারী অণুজীব। আইসক্রিম তৈরিতে সামুদ্রিক শৈবালজাত উপাদান অ্যালজিন ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক শৈবাল আয়োডিন ও পটাশিয়ামের একটি ভালো উৎস। মাছ চাষে শৈবাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্পিরুলিনা (Spirulina) নামক শৈবাল বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়, যা প্রেটিনসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

শৈবালের অপকারিতা: মানুষ ও উদ্ভিদের নানা রোগ সৃষ্টিতে শৈবাল দায়ী। যেমন এক ধরনের শৈবাল চা-পাতার রেড রাস্ট রোগ সৃষ্টি করে। জলাশয়ে শৈবালের আধিক্য দেখা দিলে জলজ প্রাণী ও মাছ অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে। শৈবালের বিষ দ্বারা বিষাক্ত সামুদ্রিক খাবার খেয়ে প্রতিবছর অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অ্যামিবা

প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্য অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। এগুলোর দেহ ক্ষুদ্রাকার। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এগুলোকে দেখা যায় না। আমিবা প্রয়োজনে দেহের আকার পরিবর্তন করে থাকে। এগুলোর দেহ থেকে আঙুলের মতো তৈরি অভিক্ষেপকে ক্ষণপদ বলে। এর সাহায্যে অ্যামিবা খাদ্য গ্রহণ ও চলাচল করে। এদের সারা দেহ একটি পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে, একে প্লাজমালেমা বলা হয়। অ্যামিবা পানিতে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে, পুকুরের তলার পচা জৈব আবর্জনার মধ্যে জন্মে।

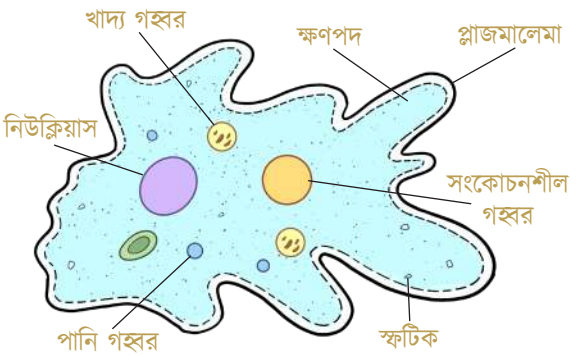

একটি অ্যামিবা। ছবিতে ক্ষণপদ ও কোষের ভেতরের খাদ্য গহ্বর বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

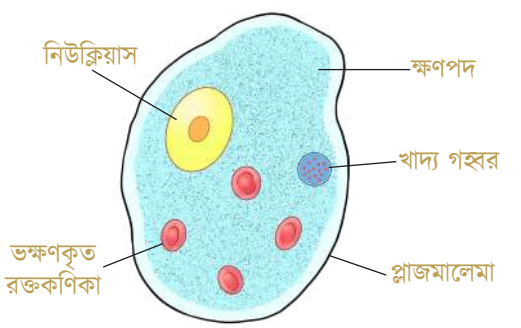

আমাদের অন্ত্রে পাওয়া এ্যান্টামিবা। এ্যামিবার মতো এদেরও ক্ষণপদ ও খাদ্যগহবর থাকে। তবে সেগুলোর ভেতরে মানুষের অন্ত্র থেকে ভক্ষণ করা রক্তকণিকাও পাওয়া যায়।

এন্টামিবা

এন্টামিবা (Entamoeba) প্রোটিস্টা রাজ্যভুক্ত আরেক ধরনের এককোষী জীব। খালি চোখে এগুলোকে দেখা যায় না। এগুলোর দেহের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, কারণ এরাও সর্বদাই অ্যামিবার মতো আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করতে থাকে। এগুলোর দেহ স্বচ্ছ জেলির মতো। তবে কখনো কখনো প্রতিকূল পরিবেশে এগুলো গোলাকার শক্ত আবরণে নিজেদের দেহ ঢেকে ফেলে। এ অবস্থায় একে সিস্ট (Cyst) বলে।

আমিবা পরজীবী হিসেবে মানুষ, বানরজাতীয় প্রাণী, বিড়াল, কুকুর, শূকর ও ইঁদুরের বৃহদন্ত্র বাস করে। মূলত অ্যামিবার সঙ্গে এন্টামিবার মূল পার্থক্য হচ্ছে, সেগুলোর এই আবাস। অ্যামিবা স্বাদু পানিতে মুক্ত জীব হিসেবে অবস্থান করে। কিন্তু এন্টামিবা অন্য জীবের ভেতর আন্ত্রিক পরজবী হিসেবে বাস করে। এগুলো মানুষের এক ধরনের আমাশয় রোগের জন্য দায়ী।

এ্যান্টামিবা কোষ বিভাজন ও অণুবীজ (স্পোর) সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। যে পদ্ধতিতে একটি স্পোর বা অণুবীজ বহুখণ্ডে বিভাজিত হয়, তাকে স্পোরুলেশন বলে। এন্টামিবা কোষের প্রোটোপ্লাজম বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুবীজ বা স্পোর গঠন করে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টিতে অণুজীবের ভূমিকা

মানুষ ও অন্যান্য জীবের অনেক অসুখ বিসুখের কারণ হচ্ছে অণুজীব। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক আমাদের শরীরে প্রবেশ করে আমাদের অসুস্থ করে। ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে। অপরিষ্কার হাত জীবাণুর জন্য একটি সুবিধাজনক বাহন। যার মাধ্যমে সহজেই এগুলো মুখগহ্বরে ঢুকে যেতে পারে। আমরা যে জামা কাপড় ব্যবহার করি তাতে লেগে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর স্থানান্তরিত হতে পারে।

বাতাসে যে ধুলাবালি উড়ে বেড়ায় তার সঙ্গে অতি সহজেই ব্যাকটেরিয়া বা তার স্পোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। হাত মেলানোর মাধ্যমেও ব্যাকটেরিয়া একজন থেকে অন্যজনে অতি সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে। পচা ও বাসি খাদ্যের মাধ্যমে জীবাণু সহজেই ছড়ায়।

আমাদের দেশে প্রতিবছরই প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হয় কলেরা ও টাইফয়েড রোগে। এগুলো ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়ার বাইরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর রূপ আবির্ভূত হয় ভাইরাস। যেমন, এইডস নামক রোগ হয় এইচআইভি ভাইরাসের কারণে। আবার ২০২০ সালে সারা পৃথিবীতে কোভিড-১৯ অতিমারি ছড়িয়েছিল সার্স-কোভি-২ নামক ভাইরাসের মাধ্যমে। মাম্পস, হাম, বসন্ত ইত্যাদিও খুবই কষ্টকর ভাইরাসজনিত রোগ। ভাইরাসজনিত এসব রোগ হাঁচি, কফ, থুতু ও কাশির মাধ্যমে সর্দি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে প্রবাহিত হয়ে ছড়ায় এবং আমাদের শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে।

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় ২/৪ দিনে এমনি রোগ সেরে যায়। তবে কিছু মারাত্মক রোগ আছে যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এইডস রোগ একবার হলে আর নিরাময় হয় না। অসুস্থ লোকের রক্ত গ্রহণ, মাদক গ্রহণ, এক সুঁই-এ বহু লোকের ইনজেকশন গ্রহণ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক থেকে এ রোগ ছড়ায়। ডেঙ্গু জ্বর, কোভিড-১৯ ইত্যাদি রোগও অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ।

একটা সময় ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবাজনিত রোগ খুবই ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে যেত। নিরাপদ পানির অভাবে এমন হতো। যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগের কারণেও জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এসব মল-মূত্রে যে জীবাণু থাকে তা ভক্ষণকারী অন্য জীব এগুলোকে ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া বৃষ্টি বা জোয়ারের পানিতে এগুলো দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবেশ পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে এবং সঠিক স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললে আমরা এসব রোগব্যাধির অনেকগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারি। নিচে আমরা এ সম্বন্ধে আরো জানব।

মানবদেহে অণুজীব সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও এন্টামিবা যেসব রোগ সৃষ্টি করে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো যত্ন সহকারে পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্বল স্বাস্থ্যের ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বহন করে। তাই সকলের উচিত সুষম খাদ্য প্রয়োজন মতো নিয়মিত গ্রহণ করা।

আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য কোনো কিছু ব্যবহার বা স্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। খাবার পানি নিরাপদ হওয়া খুবই জরুরি। কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে। পান করা, গোসল ও কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া ইত্যাদির জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত। আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ। পুকুর ও নদীর পরিষ্কার পানিও ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। মানুষ ও পশু-পাখি আক্রান্ত হলে সেগুলোর চিকিৎসা করাতে হবে।

অণুজীব দ্বারা সৃষ্ট রোগ-ব্যাধিকে প্রতিরোধ করতে হলে এলাকার সবাইকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। কীভাবে এসব জীবাণু মানবদেহে ঢুকে পড়ে এবং কী করলে এগুলোকে প্রতিরোধ করা যাবে সে সম্পর্কে নিজে ভালোভাবে জানতে হবে। বিদ্যালয়ে, মসজিদে, মন্দিরে, খেলার মাঠে, হাটে, বাজারে, যেখানে লোকসমাগম বেশি সেখানেই এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ। রোগাক্রান্ত হলে অবশ্যই রোগীকে একজন ভালো চিকিৎসকের নিকট গিয়ে পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে হবে। গ্রামে থাকা কমিউনিটি ক্লিনিক বা উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে অনেক চিকিৎসাসেবা ফ্রি পাওয়া যায়। এসব সেবা গ্রহণ করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে অনুমোদিত হাসপাতাল এবং সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়ার। গ্রামে বা পাড়া-মহল্লার হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের বদলে রোগ জটিল স্তরে পৌঁছে যায়। এ ব্যাপারে সচেতন থাকা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

জীবের ভেতর বসত করা অণুজীব

যদি বলা হয়, তোমার শরীরে তোমার নিজের কোষের সংখ্যার চেয়েও বেশি সংখ্যক অণুজীব বাস করে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সেটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। আসলেই কিন্তু তথ্যটা সত্যি। আমাদের শরীরের ভেতর অনেক অণুজীবের বসবাস। আমাদের পাকস্থলী, ত্বকের নিচে, শরীরের নানা অঙ্গ এগুলোর আবাসস্থল। এগুলো আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে। যেমন আমাদের পরিপাকতন্ত্রে থাকা কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া আমাদের পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, আমাদের খাবার সঠিকভাবে হজম করতে ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, পরিপাকতন্ত্রের এসব ব্যাকটেরিয়া থেকে বের হওয়া রাসায়নিক সংকেত আমাদের মস্তিষ্কের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদের ভেতরেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক থাকে। এরকম একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে এন্ডোফাইট (Endophyte)। এন্ডোফাইট হচ্ছে এমন সব ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক যেগুলো উদ্ভিদের কোষের ভেতর বিশেষ ক্ষতি করা ছাড়া বসবাস করে। বেশির ভাগ সময় উদ্ভিদকোষের ভেতর অণুজীবের এই সহাবস্থান সেগুলোর উভয়ের জন্য উপকারী হয়, তবে কখনো কখনো তা উদ্ভিদের জন্য প্রায় ক্ষতিকর

পরিণতিও ডেকে আনতে পারে।

প্রায় সকল উদ্ভিদের ভেতরেই এন্ডোফাইট থাকে। এসব এন্ডোফাইট বিভিন্ন ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে। তোমরা নিশ্চয়ই অ্যান্টিবায়োটিকের নাম শুনে থাকবে। উদ্ভিদের ভেতর বসবাসকারী অনেক এন্ডোফাইট বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে। এসব বিষয়ে এখনো অনেক কিছু আমাদের অজানা। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করছেন, তোমরা জেনে খুশি হবে, বাংলাদেশেও এ রকম গবেষণায় এগিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাসিনা খানের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় হোমিকরসিন (Homicorcin) নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে পাটের ভেতর বসবাস করা ব্যাকটেরিয়া থেকে। তোমরা এ ধরনের গবেষণার আরো বিস্তারিত বড় হয়ে জানতে পারবে।

অনুশীলনী ?

১। শীতকাল থেকে গরমকালে দই তৈরি করা সহজ কেন?

অধ্যায় ৬

তাপ এবং তাপমাত্রা

অধ্যায় ৬

তাপ এবং তাপমাত্রা

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ তাপ ও তাপমাত্রার
- ☑ তাপমাত্রার স্কেল
- ☑ তাপ সঞ্চালন
- ☑ আপেক্ষিক তাপ
- ☑ তাপের প্রবাহ
- ☑ পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব
- ☑ তাপ প্রদানে পদার্থের প্রসারণ

তাপ

আমাদের চারপাশে আমরা নানা ধরনের শক্তি দেখি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শক্তি আমরা নানাভাবে ব্যবহার করি। তাপ ঠিক সেইরকম একটি শক্তি এবং আমাদের জীবনে আমরা সবাই এই শক্তির সঙ্গে পরিচিত এবং কোথাও না কোথাও ব্যবহার করেছি।

আমরা তাপ প্রয়োগ করে রান্না করি, চা-কফি খাওয়ার জন্য তাপ দিয়ে পানি গরম করি, কাপড় ধুয়ে তাড়াতাড়ি শুকাতে চাইলে রোদে কাপড় দিই। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাড়তি তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করি, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিই, গরমের সময় কালো কাপড় না পরার চেষ্টা করি। এই তালিকা যত ইচ্ছা লম্বা করা যাবে।

কিন্তু তোমরা কি জানো তাপশক্তিটা কীভাবে এসেছে? এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আর এক গ্লাস গরম পানির মধ্যে পার্থক্য কী? ঠিক কী কারণে তাপশক্তি ঠান্ডা পানিতে নেই; কিন্তু গরম পানিতে আছে?

একসময় এই ব্যাপারটি নিয়ে মানুষের অনেক কৌতূহল ছিল, কিন্তু এখন আমরা জানি, সব পদার্থ অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। এই অণু-পরমাণুগুলোর গতি বা কম্পনকে সামগ্রিকভাবে আমরা তাপ হিসেবে দেখি। অণু-পরমাণুগুলো যত বেশি ছোটাছুটি করবে, সেটি তত বেশি উত্তপ্ত বলে মনে হবে। এক গ্লাস ঠান্ডা পানির ভেতরকার পানির অণুগুলো স্থির হয়ে নেই, সেগুলোও ছোটাছুটি করছে। কিন্তু যখন তাপ দেওয়া হয় তখন সেই

পানির ছোটাছুটি অনেক বেশি বেড়ে যায়। যদি বেশি তাপ দেওয়া হয়, তখন কোনো না কোনো পানির অণুর গতিবেগ এত বেড়ে যেতে পারে যে, সেটি পানি থেকে মুক্ত হয়ে বের হয়ে যেতে পারে। আমরা সেটাকে বাষ্পীভবন বলি।

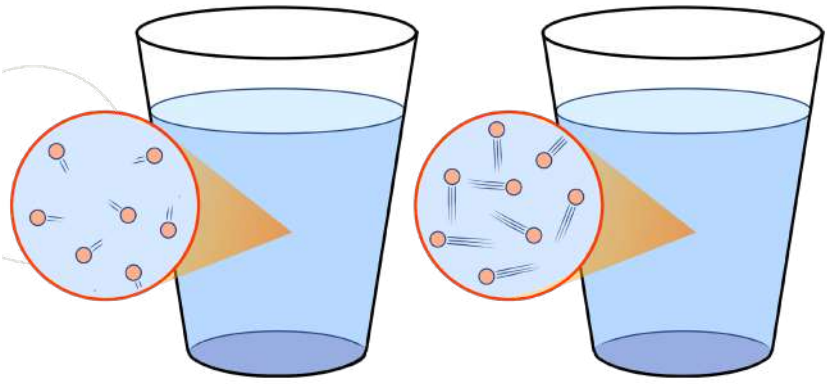

ঠান্ডা পানি গরম পানি

ঠান্ডা পানির অণুগুলো থেকে গরম পানির অণুগুলো অনেক দ্রুত বেগে ছোটাছুটি করে।

তাপমাত্রা

তাপ বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে তাপমাত্রা বলতে কী বোঝাই সেটিও বুঝতে হবে। তাপ হচ্ছে, শক্তির পরিমাণ এবং তাপমাত্রা হচ্ছে কোনোকিছু কতটুকু উত্তপ্ত কিংবা কতটুকু শীতল তার একটি পরিমাপ।

আমরা বলে থাকি চা গরম এবং আইসক্রিম ঠান্ডা—গরম এবং ঠান্ডা কথাটি দিয়ে আমরা আসলে বোঝাই 'তাপমাত্রা' নামক রাশিটি চায়ের মধ্যে বেশি এবং আইসক্রিমের মধ্যে কম। কাজেই যদি আমাদের সহ্য ক্ষমতার মধ্যে থাকে তাহলে আমরা তাপমাত্রাটি আমাদের শারীরিক অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি। তাপমাত্রা বেশি হলেই তার তাপের পরিমাণ বেশি হবে, সেটি কিন্তু সত্যি নয়।

ধরা যাক একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে সেটাকে একটা মোমবাতির শিখায় এক মিনিট ধরে রেখেছ। তারপর পাত্রের পানিতে স্পর্শ করলে হয়তো আগের থেকে অল্প একটু বেশি উষ্ণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি একটি সুচ মোমবাতির শিখায় এক মিনিট ধরে রাখো, সেটি গনগনে গরম হয়ে যাবে এবং তুমি সেটা স্পর্শ করতেই পারবে না। যার অর্থ একই পরিমাণ তাপ প্রদান করার পরও পানির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ছিল কম এবং সুচের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা অনেক বেশি। আমরা যদি পদার্থের অণু-পরমাণুর ছোটাছুটি দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, তাহলে বলব তাপ প্রদান করার পর পাত্রের পানির অণুর গতি বৃদ্ধি পেয়েছে কম কিন্তু সুচের পরমাণুগুলোর কম্পন বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি।

কাজেই বলা যেতে পারে, তোমরা তাপ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি জেনে গেছে, সেটি হচ্ছে তাপ এক ধরনের শক্তি এবং এই শক্তিটা এসেছে পদার্থের অণু-পরমাণুর সম্মিলিত গতিশক্তি কিংবা কম্পন শক্তি থেকে। অণুগুলোর গতি কিংবা কম্পন যত বেশি হবে, বস্তুটির তাপমাত্রা তত বেশি। কঠিন পদার্থের বেলায় তাপের অর্থ অণুগুলোর কম্পন। তরল পদার্থের বেলায় সেটি হচ্ছে অণুগুলোর ছোটাছুটি এবং গ্যাসের বেলায় সেটি হচ্ছে একটি অন্যটির তুলনায় মুক্তভাবে ওড়াউড়ি। যতবেশি কাপাকাপি, ছোটাছুটি কিংবা ওড়াউড়ি, তাপমাত্রা ততবেশি।

তাপমাত্রার স্কেল

তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কেলভিন (K) যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সেটা কখনো ব্যবহার করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাপমাত্রার জন্য যে এককটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি, সেটি হচ্ছে সেলসিয়াস (C) এবং মধ্যে মধ্যে জ্বর মাপার জন্য সেলসিয়াসের পাশাপাশি ফারেনহাইট (F) স্কেল ব্যবহার করি। ফারেনহাইট স্কেলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা $98.4°F$ সেলসিয়াসে যেটা $37°C$। নিচে তিনটি স্কেলের তুলনা দেখানো হলো।

স্কেল	একক	পানি জমে বরফ হওয়ার তাপমাত্রা	পানি ফুটে বাষ্প হওয়ার তাপমাত্রা	পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা এবং বরফের গলনাংকের তাপমাত্রা পার্থক্য
সেলসিয়াস	°C	০	১০০	১০০
কেলভিন	K	২৭৩.১৫	৩৭৩.১৫	১০০
ফারেনহাইট	°F	৩২	২১২	১৮০

সেলসিয়াস এবং কেলভিনের স্কেল তুলনা করলে তোমরা দেখবে সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার সঙ্গে $273.15°$ যোগ করা ছাড়া আর কেলভিন স্কেলে আর কোনো পার্থক্য নেই। স্বাভাবিকভাবেই তোমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে সেলসিয়াসের এত সহজ-সরল স্কেলের সঙ্গে ২৭৩.১৫ সংখ্যা যোগ দিয়ে কেলভিন স্কেল তৈরি করার কারণ কী?

কারণটি কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। তুমি যেকোনো কিছুর তাপমাত্রা যত ইচ্ছা বাড়াতে পারবে, তার কোনো সীমা নেই! কিন্তু তাপমাত্রা যত ইচ্ছা কমাতে পারবে না। তাপমাত্রার একটা সর্বনিম্ন মান আছে। সত্যি কথা বলতে কী তুমি এই তাপমাত্রার কাছাকাছি যেতে পারবে কিন্তু কখনই সেই তাপমাত্রায় পৌঁছাতে পারবে না। এটাকে বলে পরম শূন্য তাপমাত্রা। কেলভিন স্কেলটি তৈরি করা হয়েছে এই পরম শূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা হচ্ছে $-273.15°$ তাই সেলসিয়াস স্কেলের সঙ্গে 273.15 যোগ দিলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়। যাই হোক সেলসিয়াস স্কেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট নামে আরও একটি তাপমাত্রা স্কেল কোনো কোনো দেশে এবং জ্বর মাপার থার্মোমিটারে ব্যবহার করা হয়। সেই স্কেলে বরফের তাপমাত্রা $32°F$ এবং ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা $212°F$।

তাপ সঞ্চালন

তাপ এক ধরনের শক্তি এবং আমাদের নানা কাজে আমরা এই তাপ শক্তিকে ব্যবহার করি। কোনো কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে সেটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয়। কাজেই তাপশক্তিকে আমাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয় কিংবা সঞ্চালন করতে হয়। তিনটি উপায়ে তাপ সঞ্চালন করা হয় সেগুলো হচ্ছে তাপের পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ।

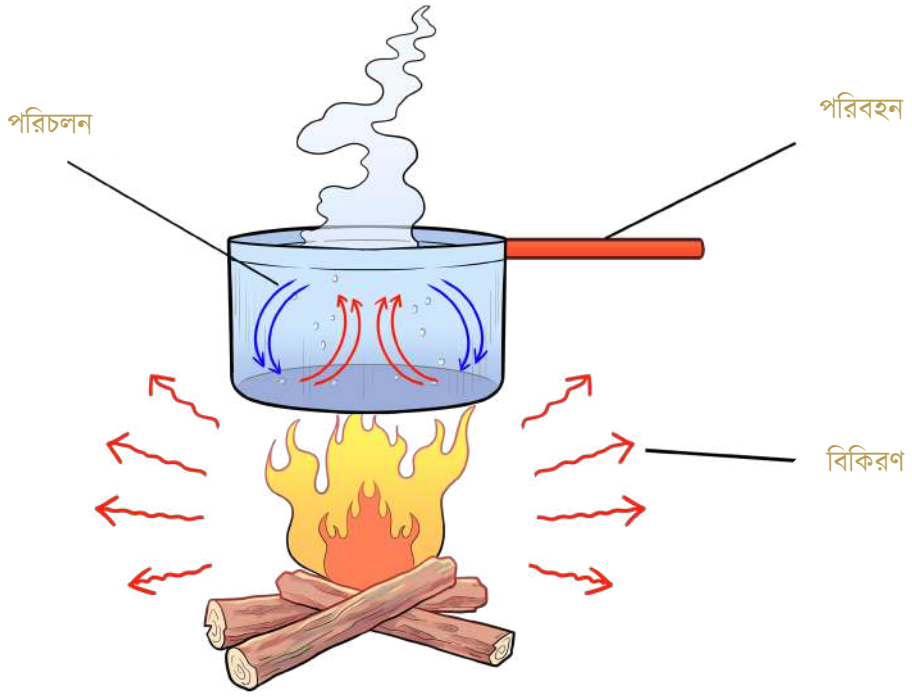

তাপের পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের উদাহরণ।

পরিবহন: আমরা সবাই রান্না করা বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত। তোমরা সবাই দেখেছ রান্না করার জন্য চুলার আগুনের ওপর একটি ডেকচি রাখা হয় এবং আগুনের উত্তাপ ডেকচির মাধ্যমে পরিবহন হয়ে ডেকচির ভেতর যা কিছু আছে তাতে সঞ্চালিত হয়। আমরা সবাই দেখেছি, তাপ যেন ঠিকভাবে সঞ্চালিত হতে পারে, সেজন্য দেখছি ডেকচিগুলো তাপ পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়।

আমরা যেহেতু জেনে গেছি কঠিন পদার্থের বেলায় তাপ হচ্ছে অণুগুলোর কম্পন তাই এবারে আমরা খুব সহজেই তাপের পরিবহন বুঝতে পারব। যখন কঠিন পদার্থের এক প্রান্ত উত্তপ্ত করা হয়, তখন সেই প্রান্তের অন্যগুলো নিজের জায়গা থেকেই কাঁপতে থাকে। তোমরা কল্পনা করতে পারো একটি অণুর সঙ্গে অন্য অণু একটা স্প্রিং দিয়ে যুক্ত। তাই একটা অণু কাঁপতে থাকলে সেটি তার পাশের অন্য অণুকেও কাঁপাতে শুরু করে। সেই অণুটি তখন তার পাশের অণুকে কাঁপায়। এভাবে কম্পনটি কঠিন পদার্থের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিবাহিত হয়।

পরিচালন: তুমি যদি কেটলিতে পানি রেখে চুলায় সেটা গরম করো, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা ফুটতে শুরু করে। কেটলির সমস্ত পানি উত্তপ্ত হওয়ার জন্য কিন্তু তাপের পরিবহন প্রক্রিয়া কাজ করে নি। তোমরা যারা গ্রীষ্মের দুপুরে পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে তারা সবাই লক্ষ করেছ পুকুরে পৃষ্ঠদেশের পানি মোটামুটি উত্তপ্ত হলেও পুকুরের নিচের পানি কিন্তু যথেষ্ট শীতল। পুকুরের পানি যদি পরিবহন পদ্ধতিতে গরম হতো তাহলে পৃষ্ঠদেশ থেকে ধীরে ধীরে নিচের পানিও গরম হতে শুরু করত।

তরল পদার্থের বেলায় সেটি গরম হওয়ার সময় ভিন্ন একটি প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে, সেটির নাম হচ্ছে পরিচলন। এই পদ্ধতিটি বোঝার আগে আমাদের আরও একটি বিষয় জানতে হবে, সেটি হচ্ছে তরল কিংবা

গ্যাসকে উত্তপ্ত করা হলে তার ঘনত্ব কমে সেটি হালকা হয়ে যায়। আমরা এখন তার কারণটাও ব্যাখ্যা করতে পারব। কোনো তরল যদি উত্তপ্ত করা হয়, তাহলে তার অণুগুলোকে আরো বেশি বেগে ছোটাছুটি করতে হয় বলে তার বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়—কাজেই একই পরিমাণ তরল একটু বেশি জায়গায় নিয়ে থাকলে তার ঘনত্ব কমে যায় বা সেটি হালকা হয়ে যায়। কাজেই কেটলিতে পানি গরম করার সময় কেটলির তলায় স্পর্শ করা পানি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উপরে উঠে যায়, তখন পাশের শীতল পানিও সেখানে উপস্থিত হয়। এভাবে পানির ভেতর একটা অভ্যন্তরীণ পরিচলন শুরু হয়, সেটি সকল পানিকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে পানিকে উত্তপ্ত করে।

গ্যাস উত্তপ্ত হলে হালকা হয়ে যায়, আমরা সেটা আগুনের শিখার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। সব আগুনের শিখা সব সময় উপরের দিকে উঠে। আগুনের শিখা হচ্ছে উত্তপ্ত জ্বলন্ত গ্যাস, কাজেই সেটি হালকা হয়ে উপরে উঠে। তুমি কখনো আগুনের শিখাকে অন্য কোনোদিকে ছড়াতে দেখবে না, শুধু ভরশূন্য মহাকাশযানে আগুনের শিখা উপরের দিকে না উঠে চারপাশে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বিকিরণ: আমরা যদি জ্বলন্ত আগুনের পাশে দাঁড়াই, তখন এক ধরনের তাপ অনুভব করি। এই তাপটি পরিবহনের মাধ্যমে তোমার কাছে আসেনি, পরিচালনার মাধ্যমেও আসিনি। আমরা যখন রোদে দাঁড়াই, তখন যে তাপ অনুভব করি, সেই তাপও পরিবহন কিংবা পরিচলন পদ্ধতিতে সূর্য থেকে তোমার কাছে পৌঁছায়নি, এই তাপ সঞ্চালনের পদ্ধতির নাম বিকিরণ।

তোমরা আগের শ্রেণিতে দৃশ্যমান আলোর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য আলোর কথা পড়েছিলে। এই অদৃশ্য আলোর অবলাল অংশটুকুর একটা অংশ আমরা চোখে না দেখলেও তাপ হিসেবে অনুভব করতে পারি। কাজেই যখন আমরা আগুনের পাশে দাঁড়াই তখন আমরা সেই অদৃশ্য তাপরশ্মিকে অনুভব করেই সেটাকে আমরা বিকিরণ বলে থাকি। বিকিরণের জন্য কোনো মাধ্যমের দরকার হয় না, সেজন্য সূর্য আর পৃথিবীর ভেতরে মহাশূন্য থাকার পরেও দৃশ্যমান আলোর সঙ্গে অদৃশ্য অবলাল রশ্মি এবং অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে চলে আসতে পারে।

আপেক্ষিক তাপ

গরম চা বা কফি খাওয়ার সময় তোমার হাতে যদি এক ফোঁটা গরম চা বা কফি পড়ে, তুমি নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নেবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কেউ যদি তোমার হাতে একই তাপমাত্রার বাতাস প্রবাহ করে, তুমি একটুখানি গরম অনুভব করবে, কিন্তু মোটেও তোমার হাতে গরমের ছ্যাঁক লাগবে না। যারা উত্তপ্ত ওভেনে কেক তৈরি করে, তারা খুবই সতর্ক থাকে যেন ওভেনের ধাতব অংশ তাদের হাতের কোনো জায়গায় স্পর্শ না করে। কিন্তু ওভেনের উত্তপ্ত বাতাস নিয়ে মাথা ঘামায় না, যদিও দুটোই একই তাপমাত্রায় থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন উত্তপ্ত তাপমাত্রার পানি বা ধাতুর সংস্পর্শে এলে আমরা যন্ত্রণা অনুভব করি কিন্তু একই তাপমাত্রার বাতাসের সংস্পর্শে এলে আমরা কেন সেই প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করি না?

তার কারণ একটি উত্তপ্ত জায়গায় সংস্পর্শে এলে আমাদের শরীরের ত্বক সেই তাপ অনুভব করবে, কিন্তু কি পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে প্রবাহিত হবে, সেটি নির্ভর করে সেই বস্তুগুলো কী পরিমাণ তাপ ধারণ

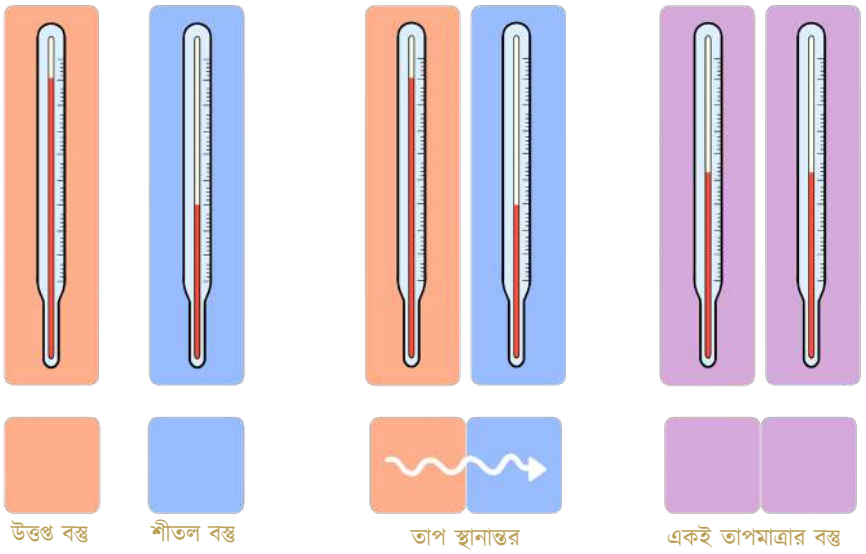

উত্তপ্ত বস্তু শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আনা হলে তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত উত্তপ্ত বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হবে।

করে আছে। যদি সেটির তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি হয়, তাহলে সেটি তোমার শরীরে অনেক তাপ সরবরাহ করে তোমার হাতে যন্ত্রণা তৈরি করতে পারে। কিন্তু যদি সেই বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা কম হয়, তাহলে সেটি তোমার শরীরে অল্প তাপ পরিবহন করবে এবং তুমি সম্ভবত একটু গরম অনুভব করা ছাড়া কিছুই টের পাবে না।

একটা বস্তুতে কী পরিমাণ তাপ সঞ্চিত আছে সেটি নির্ভর করে বস্তুটি তাপমাত্রা, তার ভর এবং তার আপেক্ষিক তাপের উপর। যেহেতু বাতাসের ভর খুবই কম তাই তার তাপ ধারণ করার ক্ষমতা খুবই কম। একটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ কম হলে অল্প তাপ প্রদান করেও অনেক উচ্চ তাপমাত্রার নেওয়া যায়। অন্যদিকে একটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বেশি হলে একই তাপমাত্রা নেওয়ার জন্য অনেক তাপ প্রদান করতে হয়।

তাপের প্রবাহ

দুটি বস্তুর তাপমাত্রা যদি ভিন্ন হয় এবং দুটিকে যদি একটি সংস্পর্শে অন্যটিকে আনা হয়, তাহলে যে বস্তুর তাপমাত্রা বেশি, সেখান থেকে তাপ যে বস্তুর তাপমাত্রা কম সেখানে প্রবাহিত হবে। সে কারণে তাপের প্রবাহের দিক দিয়ে অনেক সময় তাপমাত্রার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি তাপমাত্রা একই জায়গায় না পৌঁছাবে ততক্ষণ তাপের প্রবাহ হতেই থাকবে।

একটি সুচকে আগুনে উত্তপ্ত করা হলে তার ভেতরে মোট তাপের পরিমাণ খুব বেশি হবে না। সেই তুলনায় একটা বালতি ভরা পানিতে তাপের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু গরম সুচটিকে যদি পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সুচটির তাপের পরিমাণ কম হলেও সেটি বালতির পানিতে তার তাপ প্রবাহিত করবে।

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব

তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছ সব পদার্থ অণু দিয়ে তৈরি এবং কঠিন পদার্থে অণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে একে অন্যকে আটকে রাখে। তাপ দেওয়া হলে এগুলোর কম্পন বেড়ে যায় এবং আণবিক বন্ধন শিথিল হয়ে একে অন্যের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে নড়তে শুরু করে এবং এটাকে আমরা বলি তরল। তাপমাত্রা যদি আরও বেড়ে যায়, তখন অণুগুলো মুক্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে, তাকে আমরা বলি গ্যাস। তবে বিশেষ বিশেষ কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে সেটি সরাসরি গ্যাসে রূপান্তরিত হতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো ভৌত পরিবর্তন, কাজেই তাপ সরিয়ে নিয়ে এই তিনটি অবস্থার বিপরীত পরিবর্তনগুলোও ঘটানো সম্ভব। পাশের ছবিতে তাপ প্রয়োগ করে পদার্থের এই তিন অবস্থার পরিবর্তনগুলো দেখানো হয়েছে।

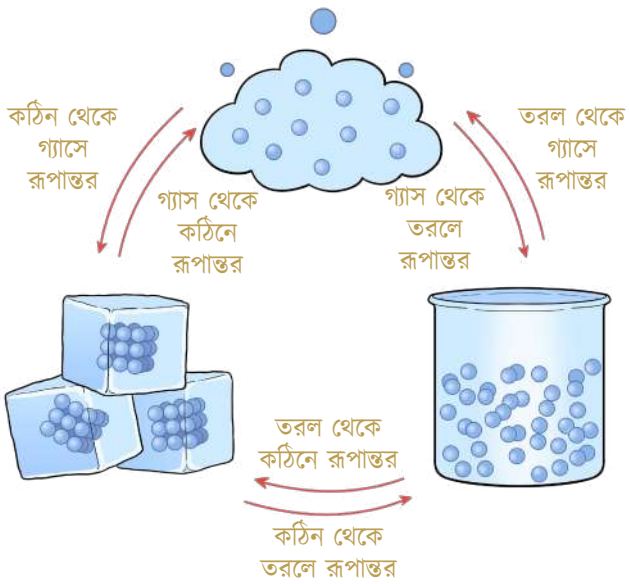

কঠিন, তরল এবং গ্যাস পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে।

কঠিন থেকে তরল এবং তরল থেকে কঠিন: একটা কঠিন পদার্থকে যখন তাপ দেওয়া হয়, তখন তার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছালে কঠিন পদার্থটি গলতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম গলন, আমরা এক টুকরা বরফকে বাইরে রেখে দিলে সেটি চারপাশের বাতাস থেকে তাপ গ্রহণ করে গলতে থাকে। যে তাপমাত্রায় গলন শুরু হয়, সেটাকে বলে গলনাঙ্ক। বরফের গলনাংক ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তাপ দিয়ে কঠিন থেকে তরল যে রকম রূপান্তর করা হয় তার উল্টো প্রক্রিয়াটিও ঘটে। তাপ সরিয়ে নিলে একটা তরল কঠিন হতে পারে। তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে কঠিনীভবন (Solidification) বলে। জ্বলন্ত মোমবাতি থেকে যে গলিত মোম গড়িয়ে পড়ে, সেটি শীতল হয়ে আবার কঠিন হয়ে যায়, এটি কঠিনীভবনের একটি উদাহরণ।

তরল থেকে গ্যাস এবং গ্যাস থেকে তরল: তরল পদার্থকে তাপ দিলে তার তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে এবং তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময় তরল পদার্থটি গ্যাসে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম বাষ্পীভবন এবং যে তাপমাত্রায় বাষ্পীভবন ঘটে, সেটাকে বলে স্ফুটনাঙ্ক। পানির স্ফুটনাংক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তাপ দিয়ে তরল থেকে গ্যাসে যে রকম রূপান্তর করা হয় তার উল্টো প্রক্রিয়াটিও ঘটে। তাপ সরিয়ে নিলে একটা গ্যাস তরল হতে পারে। একটা গ্লাসে কয়েক টুকরা বরফ রেখে দিলে আমরা দেখতে পাই গ্লাসের গায়ে জলীয় বাষ্প শীতল হয়ে বিন্দু বিন্দু পানি হিসেবে জমা হয়েছে। বায়বীয় অবস্থা থেকে এভাবে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে ঘনীভবন (Liquification) বলে।

কঠিন থেকে গ্যাস এবং গ্যাস থেকে কঠিন: যে প্রক্রিয়ায় কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ প্রদান করা হলে, সেগুলো তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation) বলে। আমরা কাপড়ে পোকা না ধরার জন্য সেখানে ন্যাপথালিন ব্যবহার করতে দেখেছি। কঠিন ন্যাপথলিনকে তাপ দিলে সেটি তরল না হয়ে সরাসরি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়।

ঊর্ধ্বপাতনের বিপরীত প্রক্রিয়াটির নাম Deposition যেখানে একটি পদার্থের বাষ্পকে শীতল করা হলে সেটি তরল না হয়ে সরাসরি কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। আয়োডিন মেশানো খাদ্য লবণের মধ্যে আয়োডিন একটি ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ। কাজেই এই আয়োডিন মেশানো খাদ্য লবণের মিশ্রণকে তাপ দিলে আয়োডিন সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তখন ঐ বাষ্পকে ঠান্ডা করে আয়োডিনের বাষ্পকে সরাসরি কঠিন আয়োডিনে পরিণত করা যায়।

তাপ প্রদানে পদার্থের প্রসারণ

তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছ সব পদার্থ অণু পরমাণু দিয়ে তৈরি এবং কঠিন পদার্থে অণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে একে অন্যকে আণবিক বল দিয়ে আটকে রাখে। এই বলকে আমরা ছবিতে দেখানো স্প্রিংয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তাপ দেওয়া হলে এগুলোর কম্পন বেড়ে যায়, তাই কম্পনের জন্য এগুলো একটু বেশি জায়গা নেয় এবং মনে হয় পদার্থের আয়তন বেড়ে গেছে। তাপ দিয়ে অনেক ধরনের কঠিন পদার্থ বিশেষত ধাতব বস্তুকে নরম করা যায় এবং গলানো যায়, ফলে সেগুলোর দ্বারা বিভিন্ন আকৃতির বস্তু তৈরি করা সম্ভব হয়।

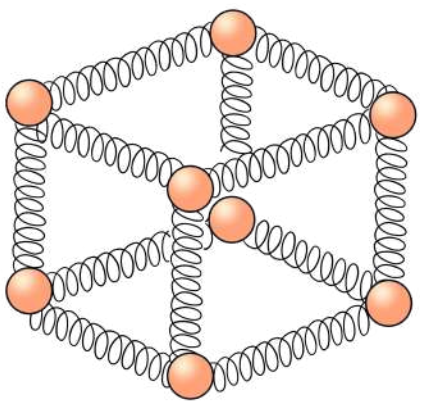

কঠিন পদার্থের অণুগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে স্প্রিং দিয়ে সংযুক্ত কল্পনা করে নেয়া যায়।

তরল এবং গ্যাসের বেলায় কণাগুলো আরও দ্রুত ছোটাছুটি শুরু করে, তাই সেগুলোর বেশি জায়গা প্রয়োজন হয় বলে মনে হয় সেগুলোর আয়তন প্রসারিত হয়েছে। থার্মোমিটার তৈরি করার সময় পারদের প্রসারণের এই ধর্ম ব্যবহার করা হয়।

তাপ প্রদান অথবা অপসারণের মাধ্যমে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারন বা সংকোচনের পরিমাণ আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী ?

১। এমন কোন তাপমাত্রা নেই যেটিতে সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেলের মান সমান হতে পারে। (কেন?) কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াস স্কেলের মান সমান। সেটি কত হতে পারে?

অধ্যায় ৭

আমাদের চারপাশের পরিবর্তন

অধ্যায় ৭ আমাদের চারপাশের পরিবর্তন

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন
- ☑ ধাতু সংরক্ষণের গুরুত্ব
- ☑ সালোকসংশ্লেষণ, পানিচক্র, কার্বনচক্র, অক্সিজেনচক্র
- ☑ রাসায়নিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বাস্তবিক প্রয়োগ

আমাদের চারপাশে প্রতিমুহূর্তে নানাকিছু ঘটে যাচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে কোনোটা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়, কিছু অপ্রয়োজনীয়, কিছু আবার ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রকৃতিতে ঘটা এইসব নানা ঘটনায় বিভিন্ন পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ভৌত পরিবর্তন: গলন এবং স্ফুটন

তোমরা সবাই কখনো না কখনো বরফকে গলে পানি হতে দেখেছ। তোমরা সবাই জানো, পানি এবং বরফ একই পদার্থ, সেগুলো আলাদা কিছু নয়, শুধু সেগুলোর অবস্থা আলাদা। যখন এটি পানি হিসেবে থাকে তখন এটি তরল এবং যখন বরফ হিসেবে থাকে তখন এটি কঠিন।

আবার তোমরা সবাই জানো পানিকে তাপ দিলে পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেটি ফুটতে শুরু করবে। তোমাদের কাছে পানির স্ফুটন কি একটি ভৌত পরিবর্তন মনে হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই তা একটি ভৌত পরিবর্তন, কারণ তখন শুধু এটি তরল থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। এটি কোনো নতুন পদার্থে পরিণত হয়নি এবং এর বৈশিষ্ট্যেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। তোমরা আগেও পদার্থের ভৌত পরিবর্তন সম্পর্কে জেনেছ। সুতরাং, বলা যায়, পদার্থের যে পরিবর্তনে শুধু অবস্থা বা আকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু নতুন কোনো ধরনের পদার্থের সৃষ্টি হয় না এবং ধর্ম একই থাকে, তাকে ভৌত পরিবর্তন বলে।

বরফের পানিতে পরিণত হওয়া পদার্থের একটি ভৌত পরিবর্তন।

রাসায়নিক পরিবর্তন: লোহার মরিচা

তোমরা আগের অধ্যায়ে লোহার মরিচা সম্পর্কে পড়েছ এবং জেনেছ এক টুকরা লোহা বাষ্পের উপস্থিতিতে বাইরে ফেলে রাখলে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং তাতে মরিচা ধরে এবং তখন সেটি ক্রমাগতভাবে ক্ষয়ে যেতে থাকে। সুতরাং, লোহাতে মরিচা ধরা একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। মরিচা কীভাবে সৃষ্টি হয় সেটা বোঝার জন্য নিম্নোক্ত কাজটি করতে পারো।

কাজ: একটি পানি দ্বারা অর্ধপূর্ণ পাত্র নাও। সাবধানে কয়েকটি পেরেক পানির মধ্যে ছেড়ে দাও যেন কোনো কোনোটি পুরোপুরি ডুবে থাকে, কোনো কোনোটি অর্ধেক পানির নিচে এবং অর্ধেক পানির উপরে থাকে। পাত্রটি ২/৩ দিন রেখে দাও। পেরেকগুলোতে কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পেয়েছ? হ্যাঁ, তুমি দেখতে পাবে যে, পেরেকগুলোতে মরিচা ধরেছে, কোনোটতে বেশি, কোনোটাতে কম। তুমি কি কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে কেন কোনোটাতে বেশি এবং কেন কোনোটাতে কম?

এখন চিন্তা করে দেখতে পারো যে, লোহাটিতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে, লোহা ও পানির বিক্রিয়ায় ফেরিক অক্সাইড তৈরি হয়েছে। এই ফেরিক অক্সাইডকে মরিচা বলে। এখানে স্পষ্ট যে, লোহা ফেরিক অক্সাইড নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়েছে। ফেরিক অক্সাইড বা মরিচা খসে খসে পড়ে এবং এভাবে লোহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই বলা যায় যে মরিচা ধরার প্রক্রিয়াটি লোহার ক্ষতিসাধন করে।

এরকম এক বা একাধিক পদার্থের সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

তামার তৈরি স্ট্যাচু অব লিবার্টি তৈরি করার সময়ে, এবং বর্তমানে

লোহার মতো সকল ধাতু সমানভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার উপরে যে অক্সাইডের স্তর তৈরি করে, সেটি যথেষ্ট শক্ত এবং সেটি ভেতরের অ্যালুমিনিয়ামকে রক্ষা করে। বাতাসে দূষিত পদার্থ থাকলে সেগুলো তামাকে ধীরে ধীরে আক্রান্ত করে এবং সেটি সবুজ রং ধারণ করে। নিউ ইয়র্কের স্ট্যাচু অব লিবার্টি সে কারণে সবুজ রংয়ের। কিন্তু কিছু ধাতু যেমন সোনা, প্লাটিনাম উন্মুক্ত বাতাসে রেখে দিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে এগুলো মূল্যবান এবং বিভিন্ন অলংকার এবং মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া

তোমরা রাসায়নিক পরিবর্তনের একটি সাধারণ পরীক্ষা—যেমন, কার্বনেট যৌগের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতক্ষ করতে পারো। রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং পরিবর্তন বোঝার জন্য নিচের সহজ পরীক্ষাটি করা যেতে পারে।

কাজ: প্রথমে কিছু চক গুড়া করে নাও, তারপর সেগুলো কোনো পাত্রে অথবা একটি চামচে নাও। এবার একটি ড্রপারের সাহায্যে বা অন্যভাবে সেখানে ফোঁটা ফোঁটা ভিনেগার যোগ করো। ভিনেগারে অ্যাসিটিক অ্যাসিড থাকে, কাজেই তোমরা দেখবে ভিনেগারের অ্যাসেটিক অ্যাসিড চকের গুড়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে বুদবুদ তৈরি করছে।

বুদবুদ সৃষ্টির কারণ হচ্ছে চক—যা মূলত ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$), তার সঙ্গে ভিনেগার (অ্যাসিটিক অ্যাসিড) যোগ করার ফলে এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে tকার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে। আমরা বুদবুদ (bubbles) দেখেছি এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের কারণেই।

এটা তাহলে কী ধরনের পরিবর্তন? অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ উৎপন্ন পদার্থ (ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি) ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিডের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এগুলোর বৈশিষ্টও ভিন্ন।

এই পরীক্ষায় তোমরা চকের পরিবর্তে ডিমের খোসাও ব্যবহার করতে পারো কারণ সেটি ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিপূর্ণ।

প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন

কোনো বস্তুর পরিবর্তনকে আমরা ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়াও প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন এবং অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যে পরিবর্তন স্থায়ী নয়, এবং পরিবর্তিত বস্তুকে

তার ধর্ম ঠিক রেখে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তাকে প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন বলে। এই ধরনের পরিবর্তনে শুধু বাহ্যিক অবস্থার অথবা আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নতুন ধরনের পদার্থের সৃষ্টি হয় না। গলন, স্ফুটন, বাষ্পীভবন, শীতলীকরণ, ঘনীভবন, দ্রবীভূতকরণ হলো প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার কিছু উদাহরণ। প্রত্যাবর্তী পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত বস্তুকে এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পূর্বের অবস্থায় ফেরত আনা যায়।

তোমরা আগের একটি অধ্যায়ে তাপ প্রদানের মাধ্যমে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন এবং সেগুলোর প্রসারণের কথা জেনেছ। এই পরিবর্তনগুলো একই সঙ্গে ভৌত পরিবর্তন এবং প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন।

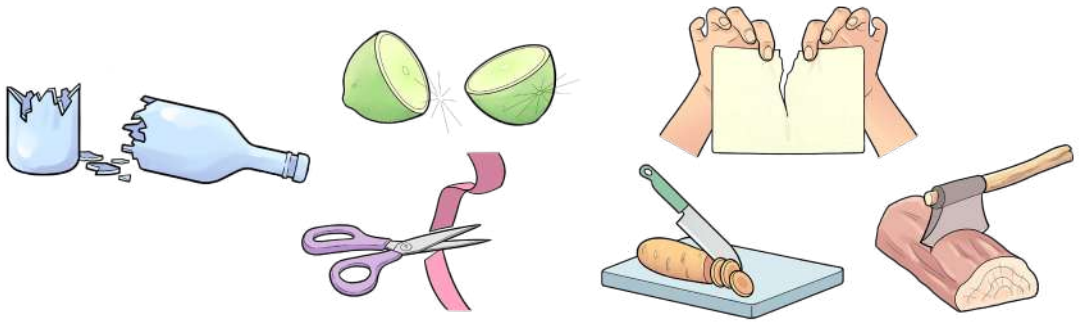

ভৌত পরিবর্তন কিন্তু প্রত্যাবর্তী নয়

অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন

অপরদিকে, যে ধরনের পরিবর্তন স্থায়ী এবং পরিবর্তিত বস্তুকে কোনো প্রকার ভৌত অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না, তাকে অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন বলে। নতুন বস্তুর সৃষ্টি এধরনের পরিবর্তনের অর্ন্তভুক্ত। রান্না করা, পোড়ানো, গুঁড়া করা ইত্যাদি হলো কিছু পদ্ধতি যার ফলে অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যেমন একটি কাঁচা ডিম সিদ্ধ করা হলে সেটিকে কোনোভাবেই আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, প্রত্যাবর্তী পরিবর্তনগুলো হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন। কিন্তু সকল ভৌত পরিবর্তন কিন্তু প্রত্যাবর্তী নয়। যেমন একটি রবার ব্যান্ড টেনে লম্বা করা যায় এবং সেটি ছেড়ে দিলে আবার সেটি আগের অবস্থায় ফিরে যায়। এটি একটি ভৌত পরিবর্তন এবং একই সঙ্গে প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন। যদি রবার ব্যান্ডটি অনেক বেশি টেনে সেটি ছিড়ে ফেলা হয়, তাহলে সেটি যদিও তখনো একটি ভৌত পরিবর্তন, কিন্তু সেটি আর প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন নয়। উপরের ছবিতে কয়েকটি ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন নয়।

অন্যদিকে রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো সব সময়েই অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন, কারণ সেগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থকে পুনরায় ব্যবহার্য করা

প্রত্যাবর্তী পরিবর্তনের মাধ্যমে প্লাস্টিককে রিসাইকেল (Recycle) বা পুনরায় ব্যবহার করা যায়। পাশের ছবিতে প্লাস্টিক রিসাইকেল চক্র দেখানো হয়েছে। প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন জিনিস যেমন পানির বোতল, খাবার সংরক্ষণের পাত্র ইত্যাদির আকৃতি পরিবর্তন করে নতুন ধরনের পাত্র তৈরি করা যায়। আবার, রিসাইকেল করা প্লাস্টিকের সাহায্যে, বিভিন্ন ফার্নিচার, খেলার মাঠের জিনিসপত্র, ইত্যাদিসহ আরো অনেক কিছু তৈরি করা যায়।

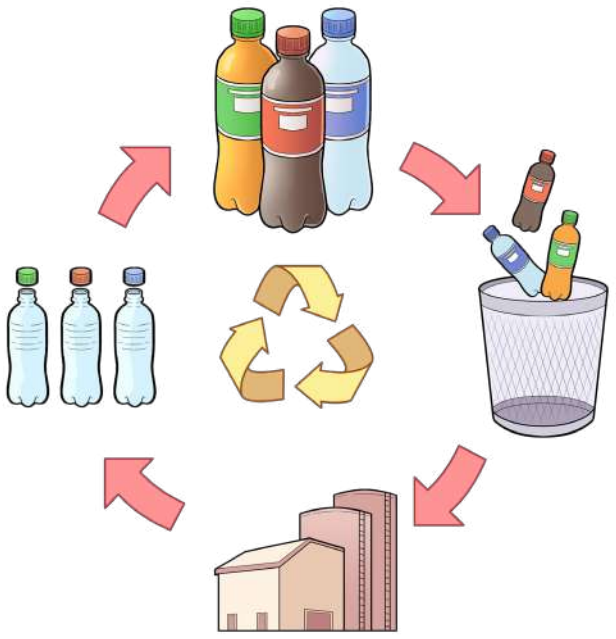

প্লাস্টিক রিসাইকেল চক্র

আমরা সকলেই জানি যে, বিভিন্ন পদার্থকে যতটা সম্ভব রিসাইকেল করে পুনরায় ব্যবহার করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি পরিবেশের আবর্জনার পরিমাণ কমাতে সহায়তা করে। এছাড়া নতুন উপকরণ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কাচ এবং প্লাস্টিকের রিসাইকেল সম্ভব, কারণ উভয়েরই রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো এমন যে তাদের উত্তপ্ত এবং ঠান্ডা করা যায় এবং উত্তপ্ত বা ঠান্ডা করার পরও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য একই রকম থাকে।

কাচের মতো কাগজ তৈরির পদ্ধতিও প্রত্যাবর্তী পদ্ধতি এবং কাগজকে রিসাইকেল করা যায়। পৃথিবীব্যাপী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা কাগজ থেকে এ ধরনের রিসাইকেল পদ্ধতির মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার্য কাগজ তৈরি করা হয়ে থাকে। নষ্ট কাগজে পানি এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে এবং পরিষ্কার করাসহ কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে আবার আগের মতো কাগজ তৈরি করা হয়।

ধাতুর ক্ষয় রোধ

ধাতুর তৈরি জিনিস যদি ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকে, তাহলে একসময় তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। আমরা যদি এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হই, তাহলে ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

কাজ: গৃহস্থালিতে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত ধাতুর জিনিসপত্রের একটা তালিকা তৈরি করো এবং কোনটা ক্রমগত ক্ষয় হচ্ছে এবং কোনটা হচ্ছে না তা লক্ষ করো। তোমরা এ সবের কারণ অনুসন্ধান করতে পারো।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, লোহার ক্ষয়রোধের জন্য কীভাবে মরিচা বন্ধ করা যেতে পারে? দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি লোহার তৈরি বিভিন্ন জিনিস, যেমন খন্তা, হাতুরি, হুক, পেরেক ইত্যাদি পানি থেকে দূরে রাখি তাহলে মরিচা থেকে বাঁচানো সম্ভব। এছাড়া, সেগুলোকে তেল অথবা গ্রিজ দ্বারা আবৃত করে রেখেও মরিচা কমানো যায়। তবে সঠিকভাবে মরিচা রোধ করার জন্য গ্যালভানাইজিং করে, রং করে কংবা তড়িৎ প্রলেপনের সাহায্যে মরিচা রোধ করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে সম্ভব হলে মরিচাবিহীন ইস্পাত ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্যালভানাইজিং (Galvanizing): আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান কাজে দস্তা বা জিংক ব্যবহার হয়ে থাকে। এসব কাজের মধ্যে গ্যালভানাইজিংয়ের জন্য দস্তার ব্যবহার অন্যতম। লোহার তৈরি জিনিসের উপর দস্তার প্রলেপ দেয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে। এক্ষেত্রে দস্তার প্রলেপ বাধা তৈরি করে লোহাকে পানি এবং অক্সিজেন থেকে রক্ষা করে, যার ফলে মরিচা ধরে না। ধাতুগুলোকে দস্তার পরিবর্তে টিনের প্রলেপ দিয়েও মরিচা থেকে রক্ষা করা যায়।

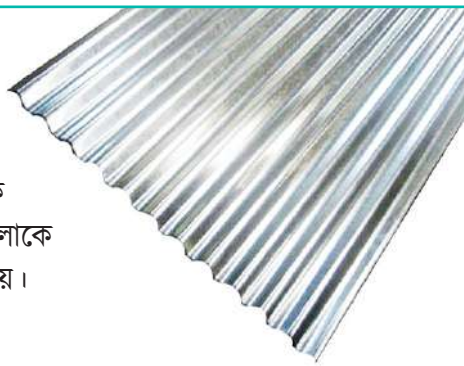

তড়িৎ প্রলেপন (Electroplating): তড়িৎ প্রলেপন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে অধিক সক্রিয় ধাতুর উপরে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে কম সক্রিয়া ধাতুর একটি প্রলেপ সৃষ্টি করে অধিক সক্রিয় ধাতুকে মরিচা থেকে রক্ষা করা হয়। লোহার তৈরি জিনিসকে সাধারণত, তামা, ক্রোমিয়াম, টিন, অথবা নিকেল দিয়ে তড়িৎ প্রলেপন করা হয়। এর মাধ্যমে গহনার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও বাড়ানোর যায় এবং কাটলারি ও মোটর যন্ত্রাংশের স্থায়িত্বও বৃদ্ধি করা যায়। এটি শুধু ধাতুর ক্ষয় রোধ করে না বরং এটাকে আকর্ষণীয় এবং চকচকে করে তোলে।

রং করা (Painting): রং করার মাধ্যমেও ধাতুর ক্ষয় রোধ করা যায়। ক্ষয়রোধ করার জন্য আমাদের বাসার রেলিং, শেলফ, গাড়ি কিংবা ইস্পাতের তৈরি বিভিন্ন জিনিসে রং করা হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রং একসময় নষ্ট হয়ে যায়। তখন এসব জিনিসকে আবার সঙ্গে সঙ্গে রং করে ফেলা ভালো।

মরিচাহীন ইস্পাত

তোমরা কি জানো মরিচাহীন ইস্পাত বা স্টেনলেস স্টিল কী এবং কেন এতে মরিচা পড়ে না? মরিচাহীন ইস্পাত কার্বন, নিকেল এবং ক্রোমিয়ামকে লোহার সঙ্গে মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। মূলত এটি এমন একটি মিশ্রণ যেটি লোহার চেয়েও কয়েকগুণ শক্ত। মজার ব্যাপার হলো, তাতে মরিচা ধরে না। নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কাজ: একটি পাতের দুই তৃতীয়াংশ পানি নিয়ে তাতে একটি পেরেক এবং একটি মরিচাহীন ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটি চামচ কিছু দিনের জন্য ডুবিয়ে রাখো।

চামচটিতে কোনো প্রকার মরিচা দেখতে পেয়েছ? না, কারণ মরিচাহীন ইস্পাতের ধর্ম সাধারণ লোহার থেকে আলাদা সুতরাং এটি পানি এবং অক্সিজেনের সঙ্গে কোনোরূপ বিক্রিয়া না করায় মরিচার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পেরেকটিতে মরিচার সৃষ্টি হয়েছে কারণ এটি সাধারণ লোহার তৈরি।

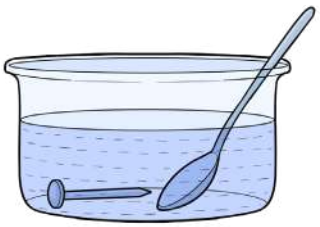

দহন

দহন বলতে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া বোঝানো হয়, যেখানে কোনো বস্তু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আলো এবং তাপ সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই এটি একটি অপ্রত্যাবর্তী পরিবর্তন। তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবসময়েই দহনের উদাহরণ হিসেবে আগুন জ্বলতে দেখেছ। তুমি যদি একটি মোমবাতি কীভাবে জ্বলে সেটি খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করো তাহলে দহনের ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

মোমের দহন

মোম জ্বলার সময় কিছু অংশ গলে তরলে রূপান্তরিত হয়ে শলিতা (wick) বেয়ে উপরে উঠে পুড়ে যায়। উত্তাপে বাষ্পীভূত মোম অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানিতে পরিণত হবার সময়ে আলো এবং তাপ তৈরি করে। যেহেতু প্রস্তুত হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন এবং পানি উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হওয়ায় আমরা তা দেখতে পারি না। এখানে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, কারণ মোম পুড়ে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি মোম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পদার্থ এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্যও মোম থেকে ভিন্ন।

অন্যদিকে, যে অংশটি গলে গিয়ে নিচে এসে ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছে সেখানে রাসায়নিক পরিবর্তন না হয়ে ভৌত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কারণ, মোম গলে অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং ধর্মের কোনো পরিবর্তন না করেই পুনরায় তা শীতল হয়ে জমাট বেঁধে আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই গলন এবং ঘনীভবন একটি প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন, কারণ এই মোম সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে আবার নতুন করে একটি মোমবাতি তৈরি করা সম্ভব।

আমাদের বাসায় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং লাকড়ি বা খড়কুটো পুড়িয়ে রান্না করাও দহনের উদাহরণ। প্রতিক্ষেত্রেই আলো এবং তাপ উৎপন্ন হয়।

দৈহিক শক্তি

আমরা যে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই তা আমাদের পাকস্থলীতে গিয়ে জমা হয়। হজম হবার পরে পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের দেহে শোষিত হয়। আমাদের দেহকোষে সেসব উপাদান ভেঙে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াটি দহনের মতোই একটি প্রক্রিয়া কারণ, সেটি সম্পন্ন করার জন্য দেহ কোষে রক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাপের সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি তৈরি হয় আমরা সেসব শক্তি ব্যবহার করে সারাদিন বিভিন্ন কাজ করে থাকি। যদি তাপ শক্তি তৈরি না হতো, আমরা কাজ করার জন্য কোনো শক্তি পেতাম না।

বড় দাবানল, ছোট মোমবাতি কিংবা আমাদের দেহকোষের দহন, সবগুলোই আসলে একধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন।

পানি চক্র, কার্বন চক্র এবং অক্সিজেন চক্র

পানি চক্র (Water cycle)

তোমরা সবাই জানো যে, আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকি। যেমন, বর্ষাকালে বৃষ্টি থেকে আমাদের দেশে পানি আসে। মধ্যে মধ্যে উজান থেকে ঢল নেমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। সেসব বন্যার পানি কোথা থেকে আসে আবার বর্ষা শেষে বৃষ্টির পানি যায়ই বা কোথায়? পরের বছর সেগুলো আবার ফিরে আসেই বা কোথা থেকে?

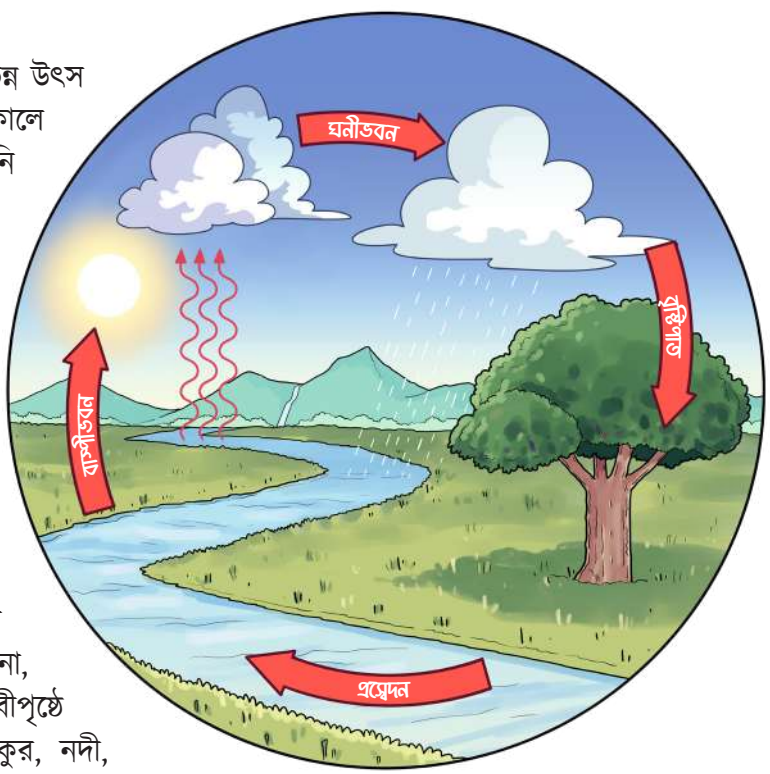

পৃথিবীতে পানি এক উৎস থেকে আরেক উৎসে এলে একটি চক্রের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। তোমরা জানো, কীভাবে বৃষ্টি হয়। সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা পানি বাষ্পে পরিণত হয়। পুকুর, নদী,

সাগর, খালে থাকা পানি থেকে সৃষ্ট সেই জলীয়বাষ্প উপরে গিয়ে শীতল হয়ে পানির কণায় পরিণত হয়। পানির কণাগুলো একত্রিত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে যা আকাশে ভেসে বেড়ায়। ছোট ছোট কণাগুলো একত্রিত হয়ে বড় কণার সৃষ্টি করে যেগুলো পরবর্তীতে বৃষ্টির পানি হিসেবে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। মেঘের পানির কণাগুলো যখন খুব বেশি ঠান্ডা হয় তখন তা জমাট বেঁধে বরফের কণায় পরিণত হয় এবং মধ্যে মধ্যে সেগুলো শিলাবৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে এসে পতিত হয়। বৃষ্টির পানি যায় নদীতে এবং ধীরে ধীরে নদী থেকে সাগরে প্রবাহিত হয়। এভাবে ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়ে পুনরায় আবার ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি হিসেবে ফিরে আসে। এই বৃষ্টির পানি আবার নদীতে যায়, তারপর আবার সাগরে। পানির এধরনের চলাচলকে বলে পানি চক্র, পাশের ছবিতে যেটি দেখানো হয়েছে।

আমরা জানি যে, পানির একটি অংশ মাটির নিচে গিয়ে জমা হয়, সেটাকে ভূগর্ভস্থ পানি বলে। আমরা প্রায়ই সেটা উত্তোলন করে পান করার কাজে, ধোয়ামোছার কাজে এবং সেচের কাজে ব্যবহার করে থাকি।

কোনো কোনো স্থানে বাতাস কিছু জলীয়বাষ্পকে মেঘ হিসেবে বহন করে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়। মেঘ ঠান্ডা হয়ে সেখানে তুষারের সৃষ্টি করে। গরমকালে সূর্যের তাপে তুষার গলে পানিতে পরিণত হয় এবং পাহাড় থেকে নিচে নেমে আস্তে থাকে। এভাবে, পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট নদীর সৃষ্টি হয়। এসব ছোট ছোট নদী আবার সমতলভূমিতে পতিত হয়ে বড় নদীর সৃষ্টি করে। সবশেষে সেই পানি গিয়ে সাগরে পতিত হয়। ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পাহাড়ের তুষারের মাধ্যমে পানিচক্রে আসে। পুনরায় আবার তুষার গলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সর্বশেষ সাগরে পতিত হয়। এভাবে পানি চক্র আবর্তিত হয়।

পানিচক্রের সঙ্গে জড়িত দুইটি প্রক্রিয়া হচ্ছে, বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি নদী-নালা, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি থেকে সূর্যের তাপে বায়ুমণ্ডলে বাষ্পআকারে চলে আসে। এই জলীয়বাষ্প ধীরে ধীরে যখন উপরে উঠে তখন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকায় জলীয় বাষ্প ঘনীভবনের মাধ্যমে ছোট ছোট পানির কণায় পরিণত হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়।

পানিচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য দুইটি প্রক্রিয়া হচ্ছে কঠিনীভবন এবং তরলীভবন। বিশেষ ক্ষেত্রে পানি চক্রে ছোট ছোট পানি বিন্দু কঠিনীভবনের মাধ্যমে জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয় যা পাহাড়ের চূড়ায় জমা থাকে। গরমের সময় তরলীভবনের মাধ্যমে এই বরফ গলে পানিতে প্রবাহিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে এই চারটি প্রক্রিয়াই ভৌত পরিবর্তন।

কার্বন চক্র (Carbon cycle)

কার্বন চক্র মূলত দেখায় কীভাবে কার্বন পরমাণু চক্রাকার প্রক্রিয়ায় এক অবস্থা বা মাধ্যম থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়। কার্বন চক্রের একটা ছবি পাশে দেয়া হলো।

কার্বন চক্রের প্রধান ধাপগুলো এরকম:

(১) প্রথম ধাপে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদে প্রবেশ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সূর্যালোকের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের খাদ্য (গ্লুকোজ) এবং আমাদের জন্য অক্সিজেন তৈরি করে।
(২) দ্বিতীয় ধাপে বিভিন্ন প্রাণী এসব উদ্ভিদ ভক্ষণ করে এবং প্রাণীদেহে এই কার্বন পরমাণু সঞ্চিত হয়।

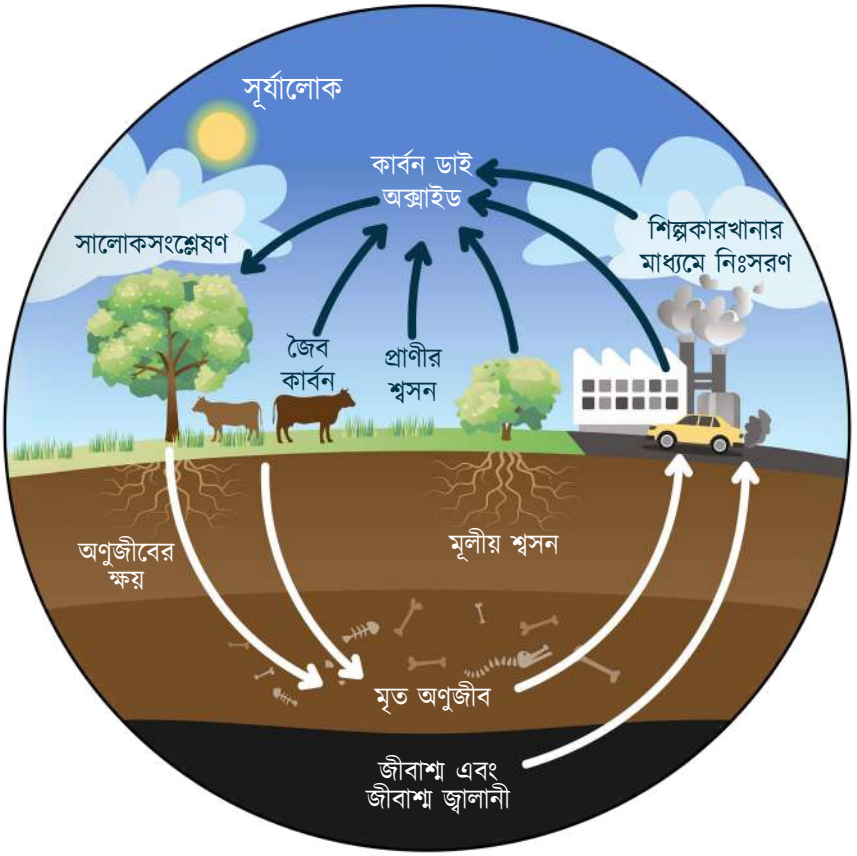

(৩) তৃতীয় ধাপে মৃত্যুর পর এসব প্রাণী এবং গাছপালা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ভেঙে যায়, তখন তার একটি অংশ সরাসরি কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে কার্বন চক্রটি সম্পূর্ণ করে।

তৃতীয় ধাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবাশ্ম জ্বালানিতে রূপান্তর। জীবাশ্ম জ্বালানিতে কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে এবং সেগুলো পচনশীল উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে তৈরি হয়। মৃত উদ্ভিদের দেহ ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ভেঙে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় মাটির নিচে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে জমা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন, অথবা পেট্রোল এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে থাকে।

(৪) জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা রান্নার কাজে, গাড়িতে, শিল্পকারখানায় এবং আরো অনেক কিছুতে ব্যবহার করে থাকি। জীবাশ্ম জ্বালানি এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে চক্রটি সম্পূর্ণ করে।

গাছপালা বা উদ্ভিদ তখন বায়ুমণ্ডল থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে পুনরায় চক্রটি শুরু করে।

এ ছাড়াও মানুষের মতো প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদ শ্বসনের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে সমুদ্রের পানিতে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষিত হয়, যেগুলো সামুদ্রিক প্রাণীর মাধ্যমে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কার্বন চক্রটি পানি চক্র থেকে ভিন্ন, এখানে বিভিন্ন ধাপে যে পরিবর্তন হয় সেগুলো কোনোটিই ভৌত পরিবর্তন নয়। কার্বন চক্রের প্রতিটি পরিবর্তনই রাসায়নিক পরিবর্তন।

অক্সিজেন চক্র (Oxygen cycle)

অক্সিজেন চক্র হলো অক্সিজেনের জৈবরাসায়নিক চক্র। এই চক্রটি মূলত বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখার কাজ করে থাকে। তোমরা জানো, উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং নিজেদের জন্য খাদ্য (গ্লুকোজ বা স্টার্চ) সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকুল উদ্ভিদের ত্যাগ করা অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অক্সিজেনের সঙ্গে খাদ্যের দহনের মাধ্যমে নিজের জন্য শক্তি উৎপন্ন করে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকুল কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, যা উদ্ভিদ পুনরায় তাদের খাবার এবং অক্সিজেন তৈরি করতে ব্যবহার করে।

সুতরাং, এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণ, পানিচক্র, কার্বন চক্র এবং অক্সিজেন চক্র খুব নিবিড়ভাবে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত।

অনুশীলনী ?

১। কাচ, প্লাস্টিক এবং কাগজ ছাড়া তোমাদের চারপাশের পরিচিত আর কী কী জিনিস রিসাইকেল করা সম্ভব?

২। বাসায় রান্নার জন্য নানা ধরণের জ্বালানি ব্যবহার হয়। তাদের মাঝে কোন জ্বালানি কম দূষণকারী? কেন?

৩। যখন একটি মোমবাতি জ্বলে তখন ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় পরিবর্তনই ঘটে। পরিবর্তনগুলি কী? এরকম পরিচিত প্রক্রিয়ার আরেকটি উদাহরণ দাও যেখানে ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় পরিবর্তনই ঘটে।

৪। যদি বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে কী ঘটতে পারে? কী কী কারণে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে পারে?

অধ্যায় ৮

কাজ, শক্তি, ক্ষমতা

অধ্যায় ৮ কাজ, শক্তি, ক্ষমতা

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ কাজ, শক্তি, ক্ষমতা
- ☑ শক্তির বিভিন্ন রূপ
- ☑ শক্তির নিত্যতা
- ☑ শক্তির রূপান্তর

কাজ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে কাজ শব্দটা অনেকভাবে ব্যবহার করি। একজন দারোয়ান গেটের সামনে একটি টুলে বসে সারা দিন বাসা পাহারা দিয়ে দাবি করতে পারেন তিনি অনেক কাজ করেছেন; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় সেটি কোনো কাজ নয়। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কাজ কথাটার সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। কোনো বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করে যেদিকে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেদিকে বস্তুটিকে একটা দূরত্ব সরানো যায় তাহলে বলা হয় বলটি কাজ করেছে! আমরা বল প্রয়োগ বলতে কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া, টানা, ঠেলে দেওয়া, আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ করাকে বোঝাই। অর্থাৎ যদি F বল প্রয়োগ করে বস্তুটিকে বলের দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করানো হয়, তাহলে ঐ বল দিয়ে করা কাজের পরিমাণ W হচ্ছে:

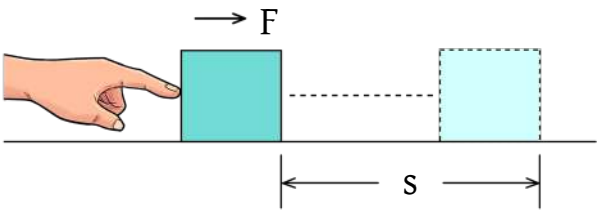

F বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুকে s দূরত্ব অতিক্রম করানো হলে কাজের পরিমাণ Fs

$$W = Fs$$

যেখানে কাজের একক হচ্ছে জুল। কাজেই আমরা যদি কোনো কিছুর উপর বল প্রয়োগ করে বস্তুটিকে নাড়াতে না পারি তাহলে

একটি ভারী বস্তুকে সরানোর জন্য যত পরশ্রমই করা হোক না কেন, বস্তুটি সরাতে না পারলে মোট কাজের পরিমাণ শূন্য।

আমাদের যত পরিশ্রমই হয়ে থাকুক না কেন কোনো কাজ হয়নি বলে ধরে নিতে হবে। ঠিক একইভাবে যদি যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয়েছে, বস্তুটি সেদিকে না গিয়ে বলের সমকোণে সরে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে তখনও কোনো কাজ করা হয়নি। বলের আকর্ষণে যখন কোনো বস্তু তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘোর তখন এই ব্যাপারটি ঘটে। যার অর্থ সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী যখন তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘোরে কিংবা পৃথিবীর আকর্ষণে যখন চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘোরে তখন কোনো কাজ করা হয় না!

শক্তি

শক্তি বলতে কী বোঝায় আমাদের সবার মধ্যে তার একটা ভাসাভাসা ধারণা আছে, কারণ আমরা কথাবার্তায় বিদ্যুৎশক্তি, তাপশক্তির কথা বলে থাকি। মধ্যে মধ্যে আমরা রাসায়নিক শক্তি বা নিউক্লিয়ার শক্তির কথাও শুনে থাকি। আলোকে শক্তি হিসেবে সেভাবে বলা না হলেও আমরা অনুমান করতে পারি, আলোও হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে শক্তিটার কথা খুব বেশি বলা হয় না, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে অসংখ্যবার যে শক্তির কথা বলা হবে সেটা হচ্ছে গতিশক্তি! কাজেই আমাদের ধারণা হতে পারে প্রকৃতিতে বুঝি অনেক ধরনের শক্তি আছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব শক্তিই কিন্তু এক এবং আমরা শুধু এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করি! তাহলে শক্তিটা কী?

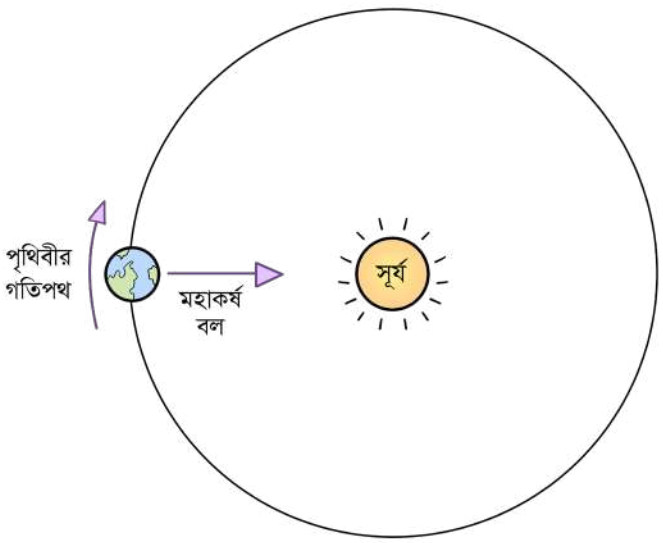

সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে পৃথিবী যখন তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘোরে তখন পৃথিবী বলের সমকোণে সরে যায় বলে কোনো কাজ করা হয় না!

শক্তি হচ্ছে কাজ করার ক্ষমতা! শুধু তা-ই না, যখন কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে কাজ করা হয়, তখন সেই বলটি আসলে বস্তুটির মধ্যে একটা শক্তি দিয়ে দেয়। তাই বস্তুটির মধ্যে যতটুকু কাজ করা হয়েছে, বস্তুটির মধ্যে ঠিক ততটুকু শক্তি সৃষ্টি হয় এবং যে বল প্রয়োগ করছে তার ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি খরচ হয়ে যায়। সেজন্য শক্তির এককও কাজের এককের সমান, জুল। কাজেই একটা বস্তুকে বল প্রয়োগ করে খানিকটা দূরত্বে ঠেলে নেওয়ার পর তার ভেতর কখনো গতির কারণে গতিশক্তি তৈরি হয়, কখনো ঘর্ষণের কারণে তাপশক্তি সৃষ্টি হয়, কখনো অবস্থানের কারণে স্থিতি শক্তির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যেটুকু কাজ করা হয়েছে সেটি কখনো নষ্ট হয় না, কোনো না কোনোভাবে এক ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী যখন তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘোরে তখন যেহেতু কোনো কাজ করা হয় না, তাই সেখানে সূর্যের কোনো শক্তি খরচ হয় না, পৃথিবীরও কোনোও শক্তি বৃদ্ধি হয় না।

ক্ষমতা

বিজ্ঞানের ভাষায় ক্ষমতা হচ্ছে কাজ করার হার। অর্থাৎ t সময়ে W কাজ করা হয়ে থাকলে ক্ষমতা P হচ্ছে:

$$P = \frac{W}{t}$$

আমরা আগেই দেখেছি, কাজ করার অর্থ হচ্ছে শক্তির রূপান্তর। শক্তির যেহেতু ধ্বংস নেই, তাই কাজ করার মধ্যে দিয়ে শক্তির রূপান্তর করা হয় মাত্র। তাই ইচ্ছে করলে আমরা বলতে পারি, ক্ষমতা হচ্ছে শক্তির রূপান্তরের হার। শক্তিকে তার একটি রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করার বেলায় সব সময়ই খানিকটা শক্তির অপচয় হয়। কাজেই সব সময়ই আমরা যে পরিমাণ কাজ করতে চাই, তার সমপরিমাণ শক্তি দিলে হয় না, একটু বেশি শক্তি দিতে হয়।

শক্তির এককটি আমাদের খুব পরিচিত না হলেও ক্ষমতার এককটি আমাদের বেশ পরিচিত। যদি প্রতি সেকেন্ডে 1 জুল কাজ করা হয়, তাহলে আমরা বলি 1 ওয়াট (W) কাজ করা হয়েছে বা শক্তির রূপান্তর হয়েছে। আমরা যদি 100 W এর একটা বাতি জ্বালাই তার অর্থ এই বাতিতে প্রতি সেকেন্ডে 100 জুল শক্তি ব্যয় হচ্ছে। নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র 1000 MW বিদ্যুৎ তৈরি হবে, সেই কথাটির অর্থ এই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে প্রতি সেকেন্ডে 1000×10^6 জুল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

আমাদের জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তে নানা ধরনের শক্তি ব্যবহার করি। যেমন পানি গরম করার জন্য তাপশক্তির প্রয়োজন হয়, দেখার জন্য আমাদের আলোশক্তি লাগে, আমরা শুনি শব্দ শক্তি দিয়ে। বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে আমরা যন্ত্রপাতি চালাই আবার রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে ব্যাটারি সেলে বিদ্যুৎ তৈরি করি। ভারী নিউক্লিয়াস ভেঙে আমরা যে নিউক্লিয়ার শক্তি পাই, সেটা দিয়েও বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করি। খাবার থেকে পুষ্টি নিয়ে আমাদের শরীরে শক্তি তৈরি হয়, আমরা কাজকর্ম করি!

শক্তির সবচেয়ে সাধারণ রূপ হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি, বস্তুর অবস্থান, আকার এবং গতির কারণে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকেই যান্ত্রিক শক্তি বলে। যান্ত্রিক শক্তির দুটি রূপ হতে পারে গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি।

গতিশক্তি: আমরা আগে বলেছি, কাজ করার ক্ষমতা হচ্ছে শক্তি। আমরা সবাই লক্ষ করেছি কোনো বস্তু গতিশীল হলে সেটা অন্য বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে সেটাকেও খানিকটা দূরত্ব ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। অন্য বস্তুকে ঠেলে খানিকটা দূরত্ব নিয়ে যাওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই সেখানে কাজ হয়েছে! কাজেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি গতির জন্য বস্তুর ভেতরে একধরনের শক্তি হয় এবং সেটাকে বলে গতিশক্তি। একটা বস্তুর ভর যদি হয় m এবং তার গতিবেগ যদি v হয় তাহলে তার গতি শক্তি হচ্ছে

$$\frac{1}{2}mv^2$$

কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, গতিবেগ যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় তার গতিশক্তিও তখন কিন্তু দ্বিগুণ হয় না, তার গতিশক্তি হয় চার গুণ বেশি। সেজন্য আমরা রাস্তাঘাটে যে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটতে

দেখি সেখানে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার প্রধান কারণ প্রয়োজনের বেশি গতিশক্তি। একটা বাস-ট্রাক বা গাড়ি যখন প্রচণ্ড বেগে ছুটতে থাকে তখন তার অনেক বড় গতিশক্তি থাকে। দুর্ঘটনার সময় এই পুরো শক্তিটার কারণে গাড়ি ভেঙেচুরে যায়, প্রচণ্ড ধাক্কায় মানুষ মারা যায়।

ছুটে যাওয়া ক্রিকেট বলে অনেক গতিশক্তি সঞ্চিত থাকতে পারে।

স্থিতিশক্তি: বল প্রয়োগ করে কোনো কিছুকে ঠেলে আমরা যদি খানিকটা দূরত্ব নিয়ে যাই, অর্থাৎ তার উপর কাজ করা হয়, তাহলে তার ভেতরে খানিকটা শক্তি দিয়ে দেওয়া হয়। যদি তখন বস্তুটির গতিবেগ বেড়ে যায়, আমরা বলতে পারি, কাজটি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যদি ঘর্ষণের কারণে উত্তপ্ত হয়ে যায় আমরা বলি কাজটুকু তাপ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বল প্রয়োগ করে কোনো বস্তুকে উপরে তুলে কোথাও রেখে দেই, তাহলে সেটি কিন্তু গতিশীল হয় না, উত্তপ্তও হয় না। যেহেতু এটার উপর কাজ করা হয়েছে, তাই এটি নিশ্চয়ই খানিকটা শক্তি পেয়েছে, তাহলে শক্তিটুকু কোথায় গিয়েছে? একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে শক্তিটুকু হারিয়ে যায়নি। এটি স্থিতিশক্তি হিসেবে বস্তুটির ভেতরেই আছে। তুমি বস্তুটিকে উপর থেকে নিচে ফেলে দিলেই দেখবে, সেটি যতই নিচে পড়তে থাকবে, ততই গতিশীল হতে থাকবে, অর্থাৎ স্থিতি শক্তিটুকু গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করবে।

অর্থাৎ পাথরটা যখন উপরে ছিল, তখন এই "উপরে" অবস্থানের জন্য তার মধ্যে এক ধরনের বিভব বা স্থিতিশক্তি জমা হয়েছিল।

শক্তির নিত্যতা

আমরা আমাদের চারপাশে যে শক্তি দেখি, সেটি অবিনশ্বর। এর কোনো ক্ষয় নেই, এটি শুধু একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন হয়। একটা পাথর উপরে তুললে তার মধ্যে স্থিতিশক্তি বা বিভব শক্তির জন্ম হয়। পাথরটা ছেড়ে দিলে বিভব বা স্থিতিশক্তি কমতে থাকে এবং গতিশক্তি বাড়তে থাকে। মাটি স্পর্শ করার পূর্বমুহূর্তে পুরো শক্তিটাই গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মাটিকে স্পর্শ করার পর পাথরটি যখন থেমে যায়, তখন তার ভেতরে গতিশক্তিও থাকে না বিভবশক্তিও থাকে না, তাহলে শক্তিটা কোথায় যায়? তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, পাথরটা যখন মেঝেতে আঘাত করে তখন সেটি শব্দ করে যেখানে আঘাত করেছে সেখানে তাপের সৃষ্টি করে অর্থাৎ গতিশক্তিটুকু শব্দ কিংবা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

একটি ছোট পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যদি আমরা এক পাশে একটু টেনে নিই, তাহলে সেটি তার স্থির অবস্থা থেকে একটু উপরে উঠে যায় বলে তার ভেতর এক ধরনের স্থিতিশক্তির জন্ম হয়। এখন পাথরটা ছেড়ে দিলে তার মধ্যে গতির সঞ্চার হয়। ঠিক মাঝখানে যখন পৌঁছায়, তখন স্থিতিশক্তির পুরোটাই গতিশক্তিতে রূপান্ত্রিত হয় এবং সে থেমে না গিয়ে অন্যদিকে যেতে থাকে এবং বেগ নিঃশেষ না হওয়া উপরে উঠতে থাকে, অর্থাৎ তার ভেতরে আবার স্থিতিশক্তির জন্ম হয়। সবচেয়ে উঁচুতে পৌঁছে গিয়ে এটি থেমে যায়, তখন আবার তার ভেতরে উল্টো দিকে গতির সঞ্চার হতে থাকে। এভাবে পাথরটি দুলতে থাকে এবং তার শক্তি স্থিতিশক্তি থেকে গতিশক্তি এবং গতিশক্তি থেকে স্থিতিশক্তির মধ্যে রূপান্তর হতেই থাকে। ঘর্ষণ এবং অন্যান্য কারণে শক্তি ক্ষয় না হলে এই প্রক্রিয়াটি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকত!

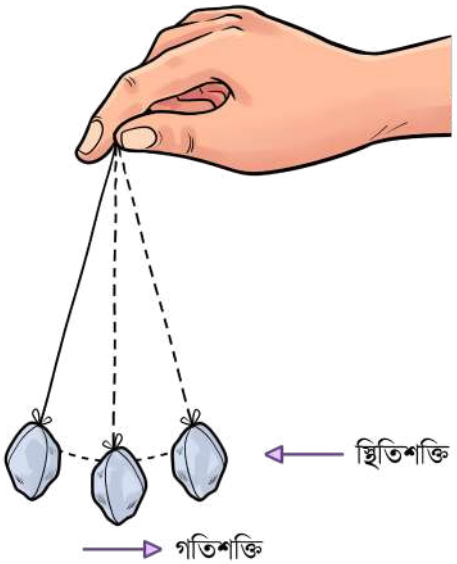

সুতায় বেধে ঝুলন্ত পাথর দুলিয়ে দিলে স্থিতিশক্তি এবং গতিশক্তির মধ্যে বিনিময় হতে থাকে।

কাজেই শক্তির রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া। শুধু বিভবশক্তি এবং গতিশক্তির মধ্যে যে রূপান্তর হতে পারে তা নয়। আমাদের পরিচিত সব শক্তিই এক রূপ থেকে অন্য রূপে যেতে পারে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে যে শক্তি দেখি, সেটি সৃষ্টিও হয় না ধ্বংসও হয় না, শুধু তার রূপ পরিবর্তন করে। এটাই হচ্ছে শক্তির নিত্যতার সূত্র।

শক্তির রূপান্তর

আমরা আমাদের চারপাশে শক্তির রূপান্তরের অনেক উদাহরণ দেখি, যেমন:

বিদ্যুৎশক্তি: শক্তির রূপান্তরের উদাহরণ দিতে হলে আমরা সবার আগে বিদ্যুৎশক্তির উদাহরণ দিই, তার কারণ এই শক্তিকে সবচেয়ে সহজে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। আমরা বৈদ্যুতিক পাখাতে বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি বা হিটারে এটা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাল্ব, টিউবলাইট বা এলইডিতে তড়িৎশক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়। স্পিকারে বিদ্যুৎ শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা সবাই আমাদের মোবাইল ফোনের ব্যাটারিকে বিদ্যুৎ দিয়ে চার্জ করি, যেখানে আসলে বিদ্যুৎশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বৈদ্যুতিক পাখাতে বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

রাসায়নিক শক্তি: শক্তি রূপান্তরের উদাহরণ হিসেবে রাসায়নিক শক্তিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের বাসায় রান্না করার জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করি, সেটা রাসায়নিক শক্তির তাপশক্তিতে রূপান্তরের উদাহরণ। মোমবাতিতে আমরা রাসায়নিক শক্তিকে আলোতে রূপান্তর করি। গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল বা এ ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করে আমরা নানারকম ইঞ্জিনে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি। তবে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে রাসায়নিক শক্তির রূপান্তরের সবচেয়ে বড় উদাহরণটি হচ্ছে ব্যাটারি, যেখানে এই শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ব্যাটারিতে রাসায়নিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়

তাপশক্তি: পরিমাণের দিক থেকে বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তির রূপান্তর হয় তাপশক্তি থেকে। যাবতীয় যন্ত্রের যাবতীয় ইঞ্জিনে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। থার্মোকাপলে (Thermocouple) দুটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোগস্থলে তাপ প্রদান করে সরাসরি তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আমরা আগুনের শিখায় রাসায়নিক কিংবা বাল্বের ফিলামেন্টে তাপকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি।

যান্ত্রিক শক্তি: জেনারেটরে যখন বিদ্যুৎ তৈরি হয়, তখন আসলে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে তারের কুণ্ডলীকে চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা হয়। ঘর্ষণের কারণে সব সময়ই তাপশক্তি তৈরি হচ্ছে, সেখানে আসলে যান্ত্রিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সোলার প্যানেলে সরাসরি আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়

আলোক শক্তি: আজকাল সোলার সেল ব্যবহার করে সরাসরি আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। এখন যদিও ফটোগ্রাফিক কাগজ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সবাই জানি আলোক সংবেদী ফটোগ্রাফির ফিল্মে আলোর উপস্থিতি রাসায়নিক শক্তির জন্ম দেয়।

শক্তির এই ধরনের রূপান্তর আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকলেও আমাদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা দরকার। শক্তি থাকলেই কিন্তু সব সময় সেই শক্তি ব্যবহার করা যায় না। পৃথিবীর সমুদ্রে বিশাল পরিমাণ তাপশক্তি রয়েছে, সেই শক্তি আমরা ব্যবহার করতে পারি না। আবার যখনই শক্তিকে একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা হয়, তখন খানিকটা হলেও শক্তির অপচয় হয়।

অনুশীলনী ?

১। নিচের ছবিতে তিনটি শক্তির মাঝে পারস্পরিক রূপান্তরের উদাহরণ দেখানো হয়েছে তুমি অন্যগুলো দেখাতে পারবে?

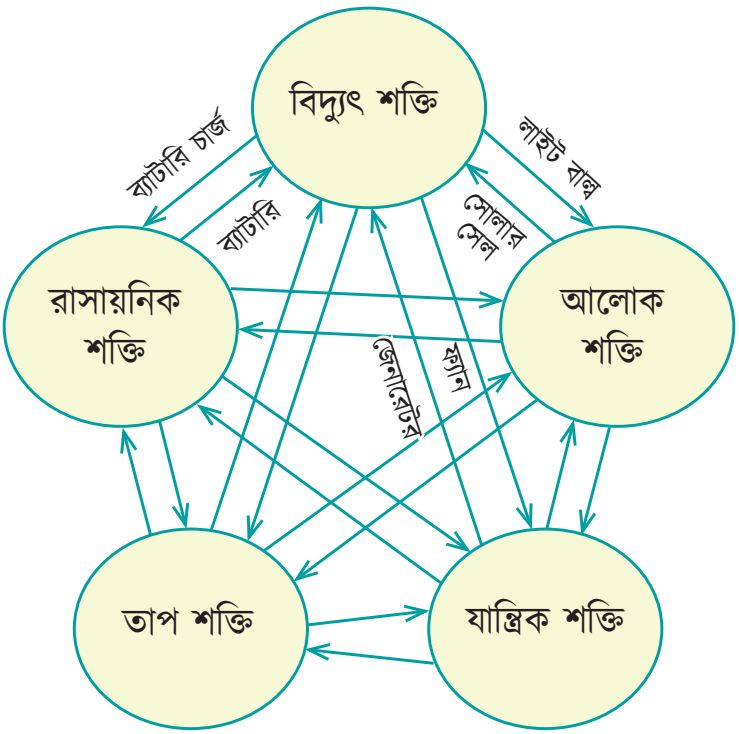

অধ্যায় ৯

ভূ-প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

অধ্যায় ৯
ভূ-প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ ভূ-প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ক স্থানীয় লোককথা, প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস
- ☑ বাংলাদেশ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সংঘটিত বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- ☑ পরিবেশের সজীব ও অজীব উপাদানের উপর বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনাবলির প্রভাব

পৃথিবীর উপরের অংশ মহাসাগর এবং স্থলভাগ নিয়ে গঠিত, যাকে আমরা একত্রে ভূপৃষ্ঠ বলি। এই ভূপৃষ্ঠে নানা রকম ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে যা আমাদের মনে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, বন্যা ইত্যাদি হচ্ছে এরকম কিছু ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনা।

এই সকল ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনা যেসব প্রক্রিয়ার কারণে হয়, তার কিছু আসে ভূপৃষ্ঠের নিচে থেকে আর কিছু আসে ভূপৃষ্ঠের উপরের উৎস থেকে। যেমন অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সুনামি ঘটে মূলত ভূ-অভ্যন্তর থেকে আগত শক্তির কারণে। ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডো ঘটে থাকে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলের শক্তির পরিবর্তনের কারণে। এসব দুর্যোগ যেমন প্রচুর পরিমাণে প্রাণহানি ঘটে, ঠিক একই সঙ্গে প্রচুর সম্পদ বিনষ্ট করে। তাই এসব দুর্যোগের কারণ জানা থাকলে প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন করে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

ভূ-প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ক স্থানীয় লোককথা, প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস

মানুষ যখন বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনের কারণগুলো জানত না, তখন তারা এই ভুপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য নানা ধরনের লোককাহিনি গড়ে তুলত। ভূমিকম্প যেহেতু কোনোরকম পূর্বাভাস না দিয়ে হঠাৎ করে আঘাত করত তাই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভূমিকম্প নিয়ে নানা ধরনের লোক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন আমাদের দেশে অনেক জায়গায়তেই গল্প প্রচলিত আছে যে বিশাল পৃথিবীটি আসলে একটি অনেক বড় একটি ষাঁড়ের শিংয়ের উপর রাখা থাকে। এই পৃথিবীর ভার বহন করতে করতে ষাঁড়টি যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সেটি তার একটি শিংয়ের উপর থেকে সরিয়ে অন্য শিংয়ের উপর নিয়ে যায়। এক শিং থেকে অন্য শিংয়ের উপর স্থানান্তর করার সময় পৃথিবীটাকে একটি ঝাঁকুনির ভেতর দিয়ে যেতে হয় এবং তখন পৃথিবীর মানুষ ভূমিকম্প অনুভব করে।

বন্যা নিয়েও আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি লোক কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে পাহাড়ের উপরে থাকা গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দেওয়ার পরেও তারা একটি ড্রাগনকে কেটে খেয়ে ফেলেছিল এবং তার শাস্তি হিসেবে গভীর রাতে মাটি ফেটে পানি বের হয়ে পুরো এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়।

কোনো কোনো এলাকায় অনাবৃষ্টির সময়য় আকাশ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে আনার জন্য ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। ২০২২ সালেও যখন পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় নি, তখন বাংলাদেশ এবং ভারতের কিছু জায়গায় অনেক ধুমধাম করে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়ছিল।

শিলা বৃষ্টিতে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়। সেজন্য এই এলাকায় একধরনের গুণিন পাওয়া যেত যারা মন্ত্র পড়ে আকাশে কালো মেঘ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নিয়ে যেতে পারে বলে জনশ্রুতি ছিল। তাদেরকে চাষিরা আমন্ত্রণ করে নিজেদের এলাকায় নিয়ে যেত এবং প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করতো বলে স্থানীয় মানুষেরা বিশ্বাস করত!

বাংলাদেশ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সংঘটিত বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক দুর্যোগ

অগ্নুৎপাত: বাংলাদেশে কোনো আগ্নেয়গিরির নেই। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে আন্দামান সাগরে ব্যারেন আইল্যান্ডে। এছাড়া জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে প্রচুর আগ্নেয়গিরি রয়েছে। মূলত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিমালাকে ঘিরে এসব আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে তা থেকে প্রচুর লাভা, গ্যাস, জলীয় বাষ্প, ছাই এবং পাথরের টুকরা নির্গত হয়। আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরক প্রকৃতির হলে তা থেকে নির্গত বস্তুসমূহ আগ্নেয়গিরি থেকে আশপাশের এলাকায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য সেই স্থান থেকে অন্য কোথাও সরে যাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ। একটি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের আগে নানা রকম আভাস পাওয়া যায়। যেমন ঘন ঘন ভূমিকম্প, পাহাড়ের আকারের পরিবর্তন, পাহাড়ের গায়ে ফাটল দিয়ে ধোঁয়া ও গ্যাস বের হওয়া ইত্যাদি। এসব নিঁখুতভাবে পর্যবেক্ষণ করে ভূতত্ত্ববিদেরা অগ্নুৎপাতের পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য দ্রুত কোথাও স্থানান্তরসহ অন্যান্য পরিকল্পনা আগে থেকে করে রাখতে হয়। লাভা, গ্যাস ইত্যাদি যেহেতু পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নামে, তাই পাহাড়ের নিচের দিকের পথ বা নদী এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়া অগ্নুৎপাতের সময় বাড়ি ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে হবে। ছোট বাচ্চা এবং পোষা পশু বাড়ির ভেতরে রাখতে হবে।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপালের একটি শহর

ভূমিকম্প: টেকটনিক প্লেটের স্থানান্তরের জন্য প্লেটের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তা ভূমিকম্প আকারে মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসে। গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু ভূমিকম্প প্রবল মাত্রার যা মানুষের জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশের আশপাশে এবং ভিতরেও বেশকিছু ফল্ট লাইন থাকায় বিভিন্ন জেলার মানুষ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।

ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, ভূপৃষ্ঠ ঝাঁকুনির ফলে রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো স্থানে ভূমিতে ফাটল দেখা দিতে পারে। ভূমিকম্পের সময় কোনো স্থানে বাড়ির ভিত্তির নিচের মাটিতে পানির পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে তা নরম হয়ে ভবন মাটির মধ্যে দেবে যেতে পারে। পাহাড়ি এলাকাগুলোতে পাহাড় ধস হতে পারে। এক্ষেত্রে পাহাড়ের কোনো পাশের মাটি বা

পাথর যদি আলগা থাকে তবে তা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে নিচের দিকে প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসে। সাগর বা মহাসাগরের তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে সুনামি নামক ভয়াবহ ঢেউয়ের সৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন ১৭৬২ সালের আরাকান অঞ্চলের ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভূমিকম্পের কারণ, পরিমাপ ও ভূমিকম্পের সময় নিরাপত্তার জন্য কী করা প্রয়োজন সেটি একাদশ অধ্যায়ে তোমাদের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুনামি: গভীর সমুদ্র বা মহাসাগরের তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে সেই এলাকার পানিতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আলোড়ন বা ঢেউ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে শত শত কিংবা কয়েক হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রসৈকতে আছড়ে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঢেউ কয়েক মিটার উচ্চতার হয়ে থাকে এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গতিবেগে ধেয়ে আসতে পারে। এই প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে সুনামি সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কারণে যে সুনামি সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণে বিভিন্ন দেশের ২,৪০,০০০ এরও অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই ১,৬৫,০০০ এর অধিক মানুষ মারা গিয়েছিল। ২০১১ সালের আরেকটি সুনামির কারণে জাপানের ফুকুশিমায় অবস্থিত একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০০৪ সালের সুনামি পরবর্তী ধ্বংসস্তূপ

সুনামি এত দ্রুত ঘটে যে প্রস্তুতির জন্য খুব কম সময় পাওয়া যায়। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। এ ক্ষেত্রে রেডিও টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত সতর্কতা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সুনামির সতর্কতা পাওয়া মাত্র যত দ্রুত সম্ভব সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত। এ ছাড়া যদি দূরে যাওয়ার সুযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে উঁচু স্থান বা ভবনে আশ্রয় নেয়া উচিত।

ঘূর্ণিঝড়: ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বাংলাদেশের প্রতিবছরই হয়ে থাকে। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড় হয় এবং এলাকাভেদে সেগুলোর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম সাইক্লোন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিকে অবস্থিত আটলান্টিক মহাসাগরে উৎপন্ন ঘূর্ণিঝড় কে হারিকেন বলা হয়। চীনের পূর্ব উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে সেখানে টাইফুন বলে। নাম যাই হোক এগুলো সবই ঘূর্ণিঝড় যা কয়েক দিন ধরে চলতে পারে এবং অনেক বড় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় বায়ুমণ্ডলের চাপের তারতম্যের কারণে সৃষ্টি হতে পারে। তবে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় সাগরে এবং তা ক্রমাগত স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে সমুদ্রের উপরোক্ত পানির তাপমাত্রা অন্তত ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হয়। একটি পর্যায়ে বৃষ্টিপাতের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের বায়ুর শক্তি হ্রাস পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্যাটালাইট থেকে তোলা ঘূর্ণিঝড়ের ছবি

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় এলাকার ঘরবাড়ি এবং কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বনের গাছপালা ধ্বংস এবং পশু-পাখির মৃত্যুর ফলে বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যত ঘূর্ণিঝড় হয়েছে তার মধ্যে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ফলে স্মরণকালের সর্বোচ্চ প্রাণহানি ঘটেছিল।

ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সময়কালে কিছু পূর্বপ্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন। যেমন ঘূর্ণিঝড়ের সময় যেন দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সরে যাওয়া যায় সেই প্রস্তুতি রাখা। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ের জন্য শুকনা খাবার, বোতলে বিশুদ্ধ পানি, কিছু অর্থ, ওষুধ ইত্যাদি ঘরের মেঝে বা মাটির নিচে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন ঘূর্ণিঝড় শেষ হলে ত্রাণ না আসা পর্যন্ত সেগুলো দিয়ে কয়েক দিন চলা যায়।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস

জলোচ্ছ্বাস: উপকূলীয় এলাকার মানুষ জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে পরিচিত। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া আরেকটি বিপর্যয় হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস। জলোচ্ছ্বাসের সময় সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের তুলনায় অনেক উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হয়। সে ক্ষেত্রে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি থাকলে জলোচ্ছ্বাস আরও উঁচু ঢেউ সৃষ্টি করে। আবার ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ যত বেশি হবে জলোচ্ছ্বাসের ঢেউয়ের উচ্চতা তত বেশি হবে।

জলোচ্ছ্বাস এর ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের মতো একই পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হয়।

টর্নেডো

টর্নেডো: বায়ুমণ্ডলের অপর একটি ঝড় হচ্ছে টর্নেডো। তবে সাইক্লোনের সঙ্গে টর্নেডোর পার্থক্য হচ্ছে এর সৃষ্টির স্থান এবং স্থায়িত্ব। টর্নেডো সৃষ্টি হয় স্থলভাগের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ার ফলে। এ ক্ষেত্রে উক্ত স্থানের বায়ু গরম ও হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং বায়ুচাপ অতিরিক্ত কমে যায়। তখন তার আশপাশের এলাকা থেকে ঠান্ডা এবং ভারী বাতাস প্রচণ্ড বেগে নিম্নচাপের দিকে ধেয়ে আসে। ফলে সেখানে ২৫০-৩০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় গতিবেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। টর্নেডোর স্থায়িত্ব সাইক্লোনের তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে। সাইক্লোন যেখানে তিন চার দিন ধরে চলে, সে ক্ষেত্রে টর্নেডোর স্থায়িত্ব মাত্র ২ থেকে ৩ মিনিট। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে টর্নেডো ক্ষুদ্র এলাকাতে ব্যাপক ধ্বংস বয়ে আনতে পারে। সাইক্লোনের ক্ষেত্রে যেভাবে আগে পূর্বাভাস পাওয়া যায়, টর্নেডোর ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ নেই।

টর্নেডো থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, আশপাশে কোনো মজবুত ভবন থাকলে তাতে আশ্রয় নেয়া। এ জন্য বিভিন্ন দেশে মানুষ টর্নেডোপ্রবণ এলাকায় মাটির নিচে ঘর করে নিজস্ব টর্নেডো আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে থাকে।

বন্যায় আশ্রয়ের জন্য যাচ্ছে ছোট শিশু

বন্যা: বন্যা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত ঘটনা। বন্যা বলতে পানির অতিরিক্ত প্রবাহকে বোঝায়, যা সাধারণত শুষ্ক স্থানকে প্লাবিত করে। বিভিন্ন কারণে বন্যা হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে অতিবৃষ্টি, নদীর নাব্যতা হ্রাস (অর্থাৎ নদী কতখানি পানি বহন করতে পারে তার ক্ষমতা কমে যাওয়া), জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। বন্যা বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। যেমন পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ি ঢলের সৃষ্টি হয় যা খুব দ্রুত কোনো স্থান প্লাবিত করতে পারে। এই ধরনের বন্যা যেমন দ্রুত ঘটে, ঠিক তেমনই দ্রুত পানি নেমে যায়। আবার দেশের অন্যান্য এলাকায় বন্যার পানি আস্তে আস্তে বাড়তে

থাকে, কয়েকদিন ধরে আটকে থাকে এবং ধীরে ধীরে পানি কমতে থাকে। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং প্রবল বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে বন্যা হতে পারে। শহরাঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বৃষ্টির সময় পানি বের হয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে মানুষের নানাভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। সাঁতার না জানা অনেকে বন্যার সময় পানিতে ডুবে মারা যায়। বন্যার পানিতে সহায়-সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ছাড়া খাদ্যের অভাব এবং বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগেও মানুষ আক্রান্ত হয়।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পূর্বপ্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। যেমন-

- বাড়ির ভিটা স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে বেশি উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে যাতে বন্যার পানি ঘরে না ওঠে।
- টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করতে হবে যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায়।
- গবাদিপশু মূল্যবান সম্পদ। এ জন্য এগুলো রক্ষার জন্য আগে থেকে উঁচু জায়গা কিংবা দূরবর্তী শুকনা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্যার মাস শুরুর আগে শুকনা খাবার, ফসলের বীজসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুদ রাখতে হবে।
- সাপের কামড় থেকে বাঁচতে নিয়মিত বাড়িঘর এবং আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখতে হবে। পারতপক্ষে রাতের বেলা অন্ধকারে চলাচল থেকে বিরত থাকতে হবে। কার্বলিক অ্যাসিড রাখলে সাপের উপদ্রব কম হয়।
- ছোট শিশুদের সাঁতার শেখাতে হবে।

পরিবেশের সজীব ও অজীব উপাদানের উপর বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনাবলির প্রভাব

আমরা এই অধ্যায়ে যে সকল ভৌগোলিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে জানলাম, সেগুলো পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা লাভা এবং পরবর্তী সময়ে ছাই দিয়ে ঢেকে যায়। ফলে সেখানকার মাটির উপরে আগ্নেয় শিলার স্তর পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মাটির উর্বরতাশক্তি পরিবর্তিত হয়ে যায়, যার ফলে সেখানে নতুন ধরনের উদ্ভিদ কিংবা ফসল জন্মায়। লাভার গতিপথে নদী থাকলে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আবার আগ্নেয়গিরির সঙ্গে যেসব বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে আসে, তা মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য ক্ষতিকর। প্রচণ্ড উত্তাপে আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি বন থাকলে তাতে আগুন লেগে যেতে পারে।

ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস হয়, এমনকি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায় যা বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের সময় কোনো স্থানের মাটি উঁচু হয়ে পাহাড়-টিলা গঠন করতে পারে। আবার অনেক স্থানে মাটি ফেটে গিয়ে অথবা নিচের দিকে দেবে গিয়ে জলাভূমিও তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া উল্লিখিত সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ এবং প্রাণহানি ঘটে।

অনুশীলনী ?

১। বাংলাদেশে প্রতি বছর অক্টোবর নভেম্বর-মাসে এবং এপ্রিল-মে মাসে ঘূর্ণিঝড়ের প্রাদুর্ভাব হয় কেন?

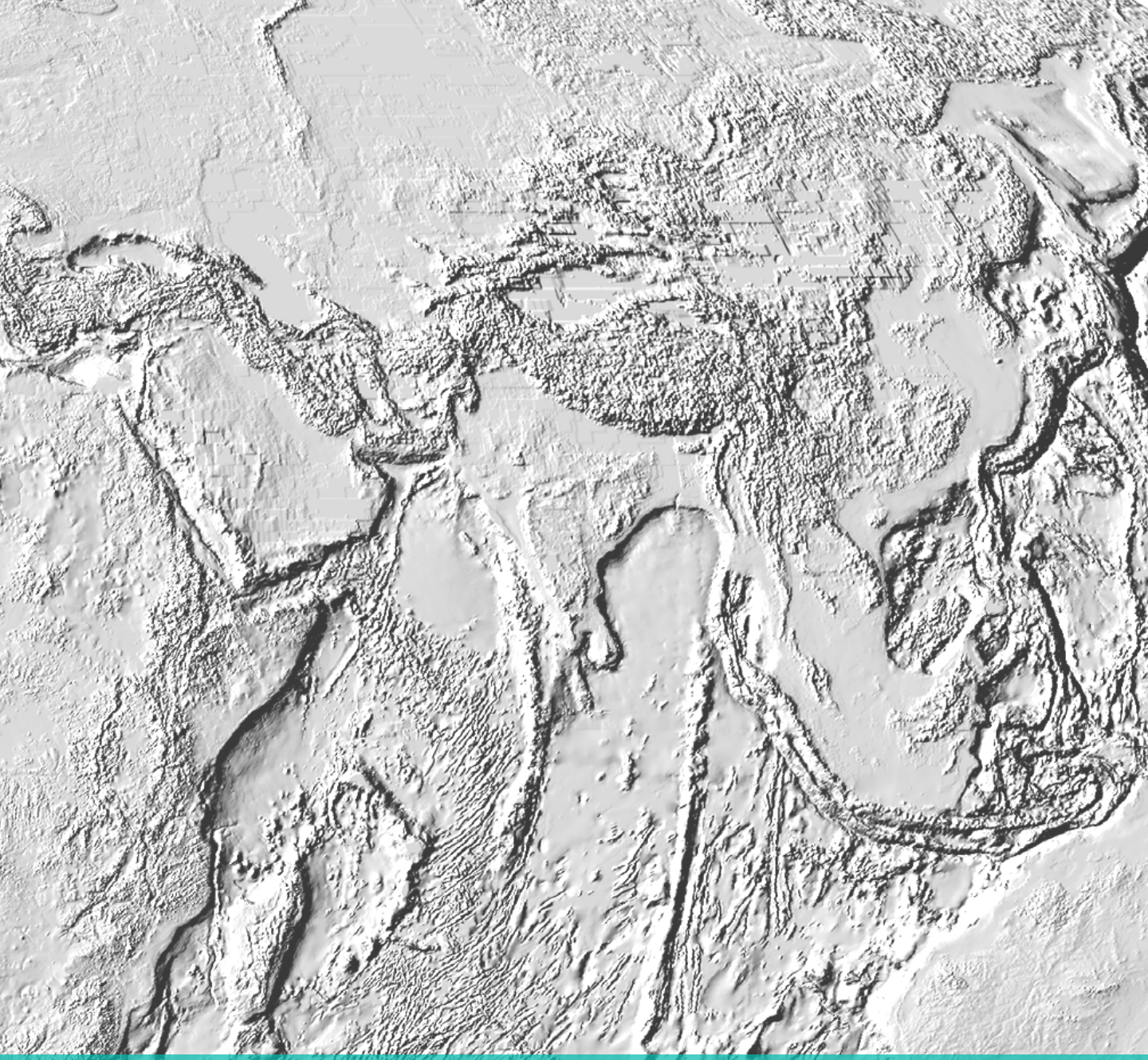

অধ্যায় ১০

ভূপৃষ্ঠ ও প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব

অধ্যায় ১০ ভূপৃষ্ঠ ও প্লেট টেকটোনিকস তত্ত্ব

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ পৃথিবীর সৃষ্টি
- ☑ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তর
- ☑ মহাদেশ ও টেকটনিকস
- ☑ টেকটোনিক প্লেটের স্থানান্তর
- ☑ সমুদ্রের সৃষ্টি ও সমুদ্রতলের প্রসারণ

পৃথিবীর সৃষ্টি

পৃথিবীতে আমরা আকাশে সারা বছর বিভিন্ন রকম মেঘ দেখতে পাই। বর্ষাকালে আকাশ একটু বেশি মেঘলা থাকে এবং এলাকাভেদে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এর কারণ হলো, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মেঘ মূলত পানির অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। তবে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশেও এক ধরনের মেঘ রয়েছে, যাকে নেবুলা (Nebula) বলা হয়। এসব নেবুলা পৃথিবীর মেঘের, পৃথিবীর কিংবা সূর্য বা সৌরজগত থেকেও অনেক বড় আকারের হয়ে থাকে। নেবুলা মূলত তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে, তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে অন্যান্য মৌলও থাকে। সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে এমনই এক নেবুলা থেকে। সেই নেবুলার অধিকাংশ নিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে সৌর জগতের একমাত্র নক্ষত্র সূর্য। সূর্য গঠিত হওয়ার সময় বা তার কিছু পরে নেবুলার বাকি উপাদান নিয়ে তৈরি হয় পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি।

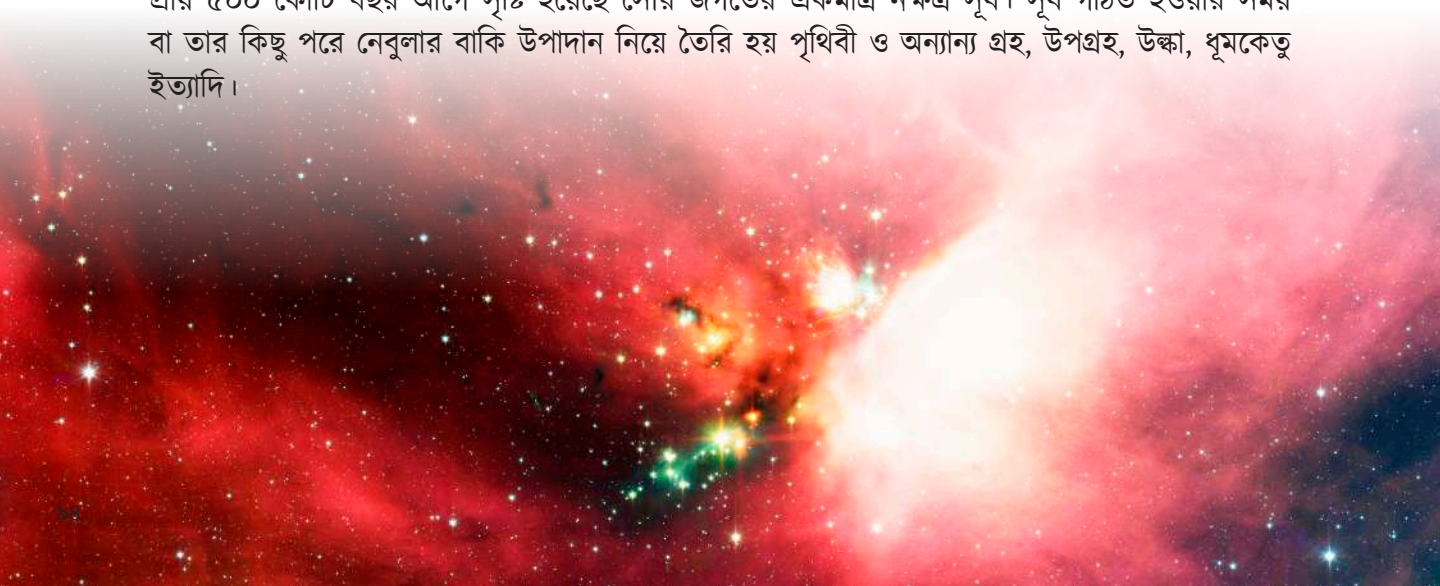

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নেবুলা থেকে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে। মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু অন্য আরেকটি বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ নির্ভর করে বস্তুগুলোর ভর এবং সেগুলোর মধ্যে দূরত্বের উপর। এই আকর্ষণের কারণে আমরা উপরে লাফ দিলেও আবার মাটিতে এসে পড়ি কিংবা একটি ঢিল আকাশের দিকে ছুড়ে মারলেও তা আবার নিচে এসে পড়ে। নেবুলার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রে যেখানে গ্যাস ঘন অবস্থায় ছিল বা গ্যাসের অণু পরমাণুগুলো কাছাকাছি ছিল, মহাকর্ষ বলের কারণে সেখানে বাকি গ্যাস জড়ো হতে শুরু করে। নেবুলার গ্যাস ক্রমাগত জড়ো হওয়ার কারণে কেন্দ্রে ভর বাড়তে থাকে এবং তখন সেখানে আরো বেশি গ্যাস ও মহাজাগতিক ধূলিকণা আকর্ষণ করতে থাকে। একপর্যায়ে সেখানে তাপ ও চাপ এত বেড়ে যায় যে ফিউশন (fusion) নামক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ ও আলো সৃষ্টি হতে থাকে এবং সূর্য একটি নক্ষত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাকি যে গ্যাস ও ধূলিকণা অবশিষ্ট থাকে, সেগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টি হয়। এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে শুরু করেছে আজ থেকে অন্তত ৪৫০ কোটি বছর আগে। প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী অনেক উত্তপ্ত ছিল। সেই সময় পৃথিবীর উপরিভাগ ছিল তরল এবং প্রবহমান। সময় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ঠান্ডা হতে থাকে। এর বাইরের অংশ শক্ত হয়ে তৈরি হয় ভূত্বক। ভূত্বক আবার অনেকগুলো ছোট বড় প্লেটে বিভক্ত যা ক্রমাগত অতি ধীরে নড়াচড়া করছে।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তর

আমরা আমাদের সামনের বিভিন্ন বস্তু থেকে শুরু করে আকাশের চাঁদ-তারা প্রভৃতি নিজের চোখে দেখতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। এ জন্য ভূতাত্ত্বিকরা ভূমিকম্পের সময় সিসমিক ওয়েভ (Seismic wave) নামে যে বিশেষ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এই তরঙ্গ

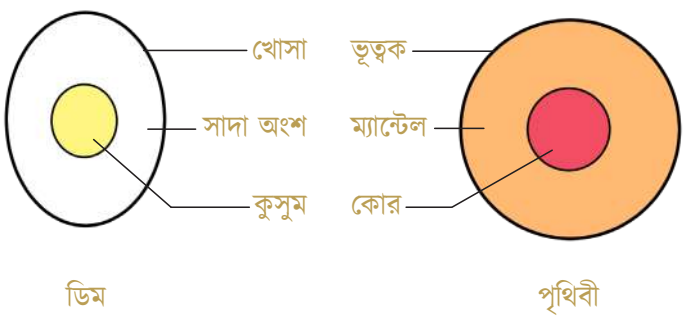

পৃথিবীর গঠনের সঙ্গে ডিমের মিল

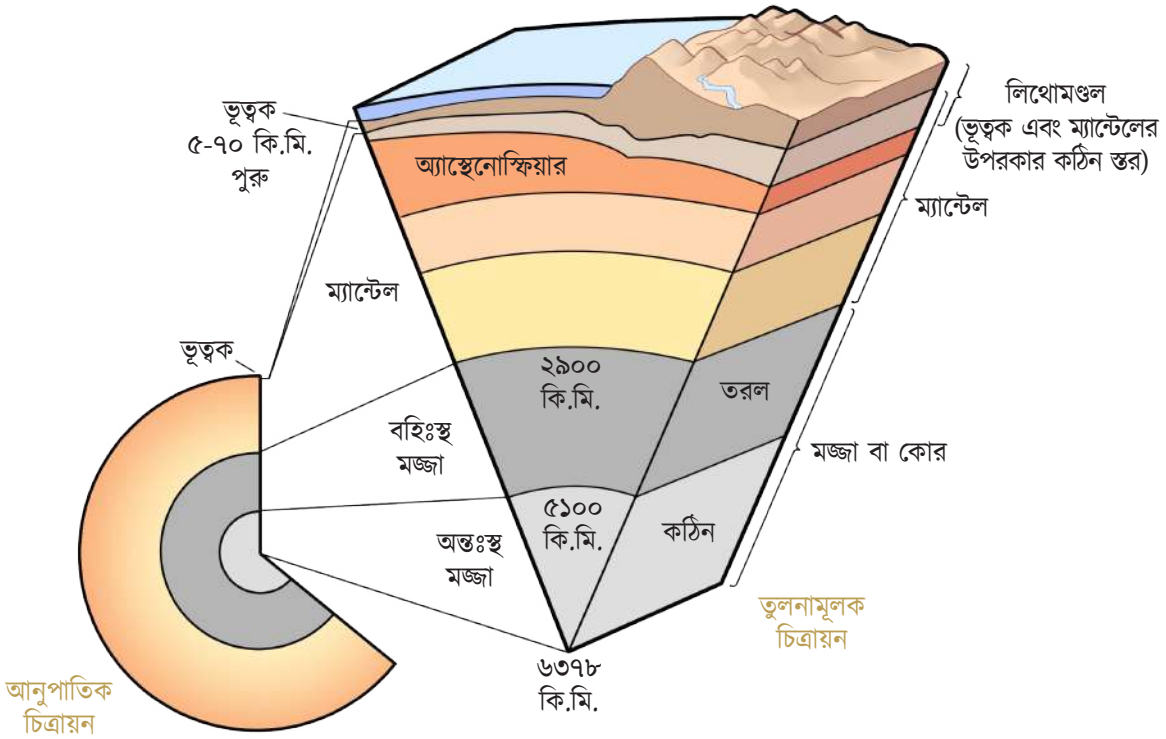

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

ভূমিকম্পের কেন্দ্রে তৈরি হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন ধরনের বস্তু থেকে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় এবং বিভিন্ন গতিতে চলাচল করে। চিকিৎসকেরা যেমন রোগীর শরীরের অভ্যন্তরের অবস্থা বোঝার জন্য ECG, X-Ray কিংবা CT-Scan ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকেন, সেভাবে ভূতাত্ত্বিকরা সিসমিক ওয়েভের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের ধারণা পেয়ে থাকেন।

পৃথিবীর গঠনের সঙ্গে ডিমের গঠনের এক ধরনের মিল রয়েছে। ডিমের যে রকম বাইরে খুবই পাতলা একটি শক্ত খোসা, পৃথিবীরও সেরকম বাইরে রয়েছে ভূত্বক। খোসার পরে ডিমের যে রকম রয়েছে ভেতরের সাদা অংশ, পৃথিবীর অভ্যন্তরেও সেরকম রয়েছে ভূ-আচ্ছাদন বা ম্যান্টল। ডিমের যেরকম মাঝখানের রয়েছে কুসুম, ঠিক সে রকম পৃথিবীর কেন্দ্রেও রয়েছে তার মজ্জা বা কোর। অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনকে ভূত্বক, ম্যান্টেল এবং কোর এই তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়।

ভূত্বক (Crust): পৃথিবীর সবচেয়ে উপরের স্তরকে ভূত্বক বা ক্রাস্ট (Crust) বলা হয়। আমরা এই স্তরের উপরে থাকি এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ত্বক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি। এই স্তরটি অন্যান্য স্তরের তুলনায় পাতলা ও ভঙ্গুর। পুরুত্ব সর্বনিম্ন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ কিলোমিটার। এই ত্বককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, (১) তুলনামূলকভাবে পুরু এবং কম ঘনত্বের মহাদেশীয় ভূত্বক এবং (২) তুলনামূলকভাবে সরু কিন্তু বেশি ঘনত্বের মহাসাগরীয় ভূত্বক হিসেবে। এই দুই প্রকার ভূত্বকই নানান ধরনের পাথর দ্বারা নির্মিত।

ম্যান্টল (Mantle): ভূত্বকের পরের স্তরটির নাম ম্যান্টল। ভূত্বকের সঙ্গে লাগানো ম্যান্টেলের স্তরটি কঠিন এবং ভঙ্গুর। উপরের ভূত্বক এবং নিচের এই স্তর নিয়ে তৈরি কঠিন অংশকে লিথোমণ্ডল (Lithosphere)

বলে। এই লিথোমণ্ডল এই স্তরটি বড় বড় বেশ কয়েকটি টুকরায় বিভক্ত এবং সেগুলোকে টেকটোনিক প্লেট বলে। লিথোমণ্ডলের পরের স্তরে বেশি তাপমাত্রার কারণে পাথর গলিত অবস্থায় থাকে বলে সেটি পুরোপুরি কঠিন নয়। তাই তার উপর ভাসমান টেকটোনিক প্লেট মোটেও স্থির নয়, সেগুলো বিভিন্ন দিকে বছরে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার সরে যেতে থাকে। টেকটোনিক প্লেটের এই গতিবিধি আমাদের ভূমণ্ডলের গঠনে খুব বড় একটি ভূমিকা পালন করে, টেকটোনিক প্লেটের গতিবিধির কারণেই পর্বতমালা এবং গভীর সমুদ্রে খাদের সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণেই পৃথিবীতে ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে।

ম্যান্টেলের বাকি অংশটুকু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের সবচেয়ে পুরু স্তর। এটি প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পুরু এবং পৃথিবীর প্রায় ৮৫ শতাংশই এই ম্যান্টেল দিয়ে গঠিত। এই স্তরে তাপ এবং চাপ অত্যন্ত বেশি। ম্যান্টেলের ভেতরের স্তর কোর থেকে আগত তাপের পরিচলন ম্যান্টলের উপরে ভাসমান লিথোমণ্ডলকে স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।

মজ্জা বা কোর (Core): ম্যান্টলের নিচে রয়েছে মজ্জা বা কোর। পৃথিবী সৃষ্টির সময় যখন এটি অনেক উত্তপ্ত এবং তরল অবস্থায় ছিল, তখন লোহা, নিকেল এবং অন্যান্য ভারী মৌল মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে পৃথিবীর কেন্দ্রে এসে জমা হয়। কাজেই এই স্তরে লোহা ও নিকেল ধাতুর প্রাধান্য রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য ভারী ধাতু। মজ্জা বা কোর দুই অংশে বিভক্ত, উপরের অংশটি বা বহিঃস্থ মজ্জা তরল এবং সেটি প্রবাহিত হতে পারে। এই স্তরের উপরের ম্যান্টল ও অন্যান্য স্তরের ভরের কারণে এখানে চাপও বেশি। লোহা এবং নিকেলের প্রবাহের কারণে এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় এবং সেই বিদ্যুতের কারণে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে। তোমরা সবাই জানো, এই চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য পৃথিবীতে কোনো চুম্বক ঝুলিয়ে দিলে সেটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ঝুলে থাকে। এই চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সূর্যের ক্ষতিকর সৌর ঝড় থেকে রক্ষা করে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন জীবের বেঁচে থাকার জন্য এই চৌম্বক ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর একেবারে অভ্যন্তরে রয়েছে অন্তঃস্থ মজ্জা। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য বহিঃস্থ মজ্জার মতোই তবে তাপ এবং চাপ আরও বেশি। অধিক চাপের কারণে এই স্তর কঠিন। ধারণা করা হয় যে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ মজ্জার গঠনকারী উপাদানের মধ্যে যেসব মৌল তেজস্ক্রিয়, সেগুলোর তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ উত্তাপের উৎস।

মহাদেশ ও টেকটনিকস

মহাদেশগুলোর অপসরণ

মহাদেশ বলতে পৃথিবীর সমুদ্রের (অথবা মহাসাগরের) পানির উপরে অবস্থিত স্থলভাগকে বোঝানো হয়, পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশের তিনভাগই পানি এবং মাত্র এক ভাগ স্থল।

আদি পৃথিবীর উত্তপ্ত তরল উপরিভাগ ধীরে ধীরে ক্রমাগত ঠান্ডা হবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান কঠিন ভূত্বক। কিন্তু এর উপরিভাগ কঠিন এবং শীতল হলেও ভূত্বকের নিচের অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনও উত্তপ্ত। ভূত্বক এবং ম্যান্টলের উপরের কঠিন অংশ নিয়ে যে লিথোমণ্ডল গঠিত, সেটি তার নিচের ম্যান্টলের অপেক্ষাকৃত তরল বা সঞ্চালনশীল অংশের উপর অতি ধীরে গতিশীল রয়েছে। লিথোমণ্ডল অনেকগুলো

মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় প্লেটে বিভক্ত। এই সকল প্লেটে নানান দিকে গতিশীলতাকে প্লেট টেকটোনিক বলা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। তোমরা হয়তো বাসায় চুলার উপর পাত্রে দুধ গরম করার সময় তাতে সর পড়তে দেখেছ। দেখবে চুলার আগুনে আঁচ কমিয়ে দুধ জাল দিলে সর নড়াচড়া করে। দুধের সরের গতিশীলতা বেশি হওয়ায় তা আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু টেকটোনিক প্লেটের গতি (বছরে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার মাত্র) অতি অল্প হবার কারণে তা আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। তবে কয়েক লক্ষ বছর ধরে এই গতি চললে তা ভূপৃষ্ঠে অনেক পরিবর্তন আনে। টেকটোনিক প্লেটের এই গতির ফলে প্লেটের উপর অবস্থিত মহাদেশগুলোও গতিশীল হয়। কখনো মহাদেশগুলো একটি অপরটির দিকে অগ্রসর হয়, আবার কখনো একটি অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। একে মহাদেশের অপসরণ বলে। এমন ঘটনার কারণে দক্ষিণ আমেরিকা কয়েক কোটি বছরে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। একসময় এই দুটি মহাদেশ একত্রে ছিল যার প্রমাণ উভয় মহাদেশ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্ম থেকে পাওয়া গেছে।

প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে

১৫ কোটি বছর আগে

১০ কোটি বছর আগে

বর্তমানে

মহাদেশগুলোর ধীরে ধীরে সরে যাওয়া

প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সকল মহাদেশ মিলে একটি বৃহৎ মহাদেশ ছিল যার নাম ছিল প্যাঞ্জিয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে অনেকগুলো মহাদেশে বিভক্ত হয়েছে। আবার একই কারণে বর্তমান ভারত অস্ট্রেলিয়া থেকে পৃথক হয়ে বর্তমান এশিয়া মহাদেশের অংশ হয়ে গেছে এবং যে স্থানে সংযোগ ঘটেছে, সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা।

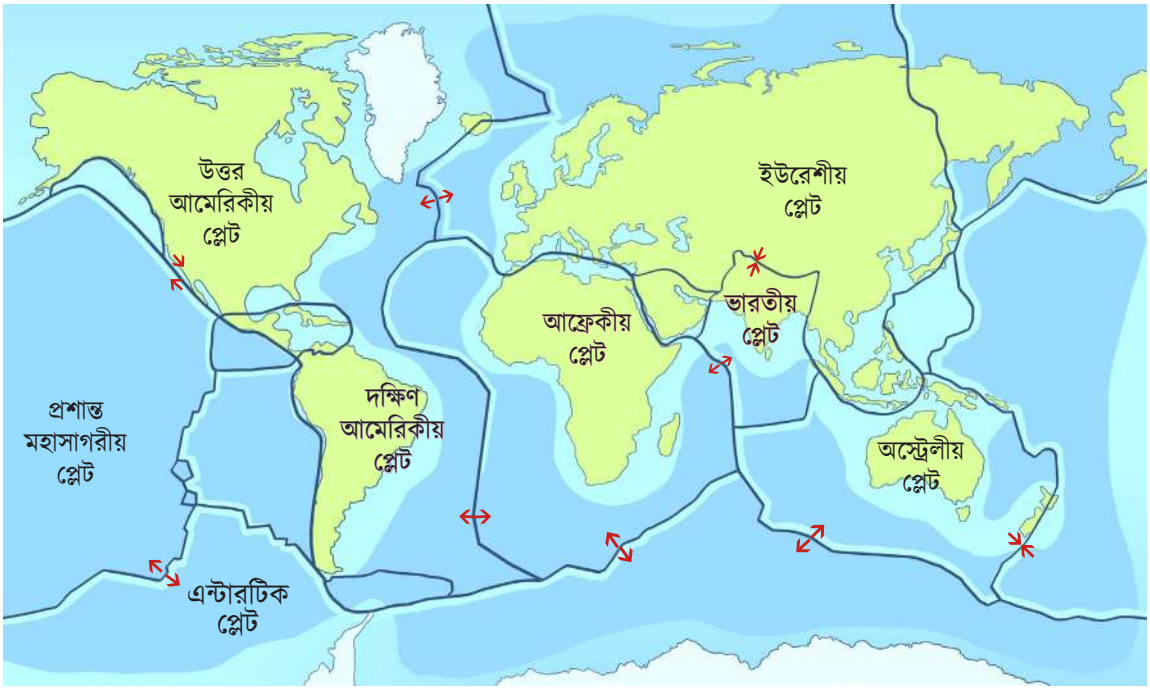

ছবিতে পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান দেখানো হলো। এখানে তীর চিহ্ন দ্বারা টেকটনিক প্লেটগুলোর গতির দিক দেখানো হয়েছে।

টেকটোনিক প্লেটের স্থানান্তর

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে লিথোস্ফিয়ার বেশ কয়েকটি ছোট-বড় টেকটনিক প্লেটে বিভক্ত এবং সেগুলো বিভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তোমরা তাপের তিনটি প্রবাহ সম্পর্কে পড়ার সময় 'পরিচলন তাপের প্রবাহ' পড়েছ, ম্যান্টলের ভেতরেও সে ব্যাপারটি ঘটে। ম্যান্টলের মধ্যে যে পরিচলন স্রোত কাজ করে, তার কারণে তার উপরে ভাসমান টেকটোনিক প্লেটগুলো বিভিন্ন দিকে গতিশীল হয়। যে সকল এলাকায় দুটি টেকটোনিক প্লেট পাশাপাশি অবস্থান করে, সেখানে সেগুলোর মধ্যে নিচের তিন ধরনের যেকোনো এক প্রকার স্থানান্তর দেখা যায়।

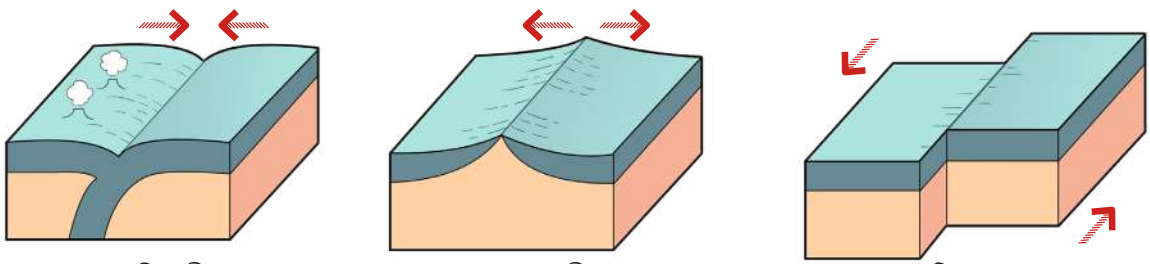

টেকটোনিক প্লেট বা পাতের বিভিন্ন ধরনের সীমানায় পাতের স্থানান্তর।

ভারতীয় টেকটোনিক প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা

অভিসারী (Subduction): প্লেটগুলো একটি অপরটির দিকে এসে সংঘর্ষ ঘটতে পারে। তখন তুলনামূলকভাবে ভারী প্লেটটি অন্য প্লেটের নিচে ঢুকে যায়। সংঘর্ষের সীমানায় যেটি উপরে থাকে, সেটি উপরে ওঠার সময় পর্বতমালা তৈরি করে। ভারতীয় টেকটোনিক প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে এভাবে হিমালয় পর্বতমালা তৈরি হয়েছে। সংঘর্ষের সীমানায় ভারতীয় প্লেট ইউরেশিয়ান প্লেটের নিচে ঢুকে গেছে। অভিসারী গতির কারণে বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্পও হয়ে থাকে।

মিড আটলান্টিক রিজ

অপসারী (Spreading): টেকটোনিক প্লেটগুলো যখন একটি অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন সেগুলোর সীমানাকে বলে অপসারী প্লেট সীমানা। অপসারী প্লেট সীমানার সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া মিড আটলান্টিক রিজ। সমুদ্রের তলদেশ থেকে বের হয়ে যখন এটি আইসল্যান্ডের ভেতর দিয়ে গেছে তখন স্থলভাগেও এটি দেখা যায়। অপসারী গতির কারণে সাধারণত সমুদ্রের তলদেশের বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

নিরপেক্ষ (Lateral): একটি প্লেট অপরটির সঙ্গে পাশাপাশি পিছলে যেতে পারে তখন দুটো প্লেটের সংযোগস্থলকে বলে নিরপেক্ষ প্লেট সীমানা। এই ধরনের স্থানান্তরের কারণে সেই প্লেটের সীমানাতে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয় এবং যখন সেই শক্তি সীমানার ধারণক্ষমতার বেশি হয়ে যায়, তখন ভূমিকম্পের মাধ্যমে সেই শক্তি নির্গত হয়। একটি অত্যন্ত পরিচিত নিরপেক্ষ প্লেট সীমানা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া সান এন্ড্রিয়াজ ফল্ট লাইন। এই সীমানায় অচিন্তনীয় পরিমাণ শক্তি জমা হয়ে আছে বলে অনুমান করা হয় এবং যে কোনো সময়ে একটি বড় ভূমিকম্পের মাধ্যমে শক্তি নির্গত হবে বলে আশঙ্কা করা হয়।

সান এন্ড্রিয়াজ ফল্ট লাইন

সমুদ্রের সৃষ্টি ও সমুদ্রতলের প্রসারণ

অতিমহাদেশ প্যাঞ্জিয়ার সময় পুরো পৃথিবীতে মহাসাগরও ছিল একটি, যার নাম ছিলো টেথিস সাগর (Tethis sea)। এই সাগর সৃষ্টি হতেও অনেক কোটি বছর সময় লেগেছে। মূলত নেবুলা থেকে পৃথিবী সৃষ্টির পর তাতে বহু বছর ধরে প্রচুর উল্কাপাত হয়, সেগুলোতে অবস্থিত পানি ছিল বর্তমান পৃথিবীর সাগরের পানির উৎস। এ ছাড়া পৃথিবীর গঠনের পর যে গ্যাসীয় পানি ভূত্বক থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে তা-ও পৃথিবীর মহাসাগরের পানির উৎস।

আমরা আগে দেখেছি যে টেকটোনিক প্লেটের গতিশীলতা তিন ধরনের হতে পারে। যখন একটি প্লেট অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন সেই ফাঁকা স্থানে নতুন মহাসাগরীয় প্লেট সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে সমুদ্রতলের প্রসারণ হয়ে থাকে। এই কারণে বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশ একটি অপরটি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং মহাদেশ দুটির মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর।

অনুশীলনী ?

১। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬ হাজার কিলোমিটার, এর মাঝে পৃথিবীর ম্যান্টল পৃথিবীর ব্যাসার্ধের অর্ধেক ৩ হাজার কিলোমিটার পুরু। কিন্তু এই ম্যান্টল পৃথিবীর ৮৫% অংশ ধারণ করে। তার কারণ কী?

অধ্যায় ১১

ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ

অধ্যায় ১১ ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ টেকটোনিক প্লেটের সঙ্গে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির মতো ঘটনার সম্পর্ক
- ☑ বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে টেকটোনিক প্লেটগুলোর সময়ের সঙ্গে বিবর্তন
- ☑ ভূমিকম্পের পরিমাপ
- ☑ ভূমিকম্পে নিরাপত্তা

তোমরা হয়তো অনেকেই আচমকা পায়ের নিচের মাটি অথবা ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠার সময় চমকে উঠেছ। অনেক ক্ষেত্রে এ রকম কাঁপুনি মনে এত ভয় ঢুকিয়ে দেয় যে, মনে হয় আবার কখন যেন মাটি কেঁপে উঠবে। মাটি বা ভূমি কেঁপে ওঠার এই ঘটনাকে আমরা ভূমিকম্প বা Earthquake বলি। যেহেতু মাটি কাঁপছে, সেহেতু মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মাটির নিচে এমন কিছু আছে অথবা কিছু একটা ঘটনা ঘটছে যা উপরের গাছপালা, ঘরবাড়িসহ বিশাল এলাকার মাটিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আবার বাংলাদেশে না থাকলেও পৃথিবীর এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে মাটি ও পাথরের ভিতর থেকে গলিত পাথর বা ম্যাগমা (Magma) বের হয়ে আসে (ম্যাগমা ভূত্বকের বাইরে বের হয়ে আসলে তাকে লাভা বলে)। কখনো তা ঘটে শান্তভাবে আবার কখনো ব্যাপক বিস্ফোরণের মাধ্যমে। একে আমরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে থাকি। এসব ঘটনা কীভাবে ঘটে তা জানতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে কেন এবং কীভাবে ভূমিকম্প ঘটে।

টেকটোনিক প্লেটের সঙ্গে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির মতো ঘটনার সম্পর্ক

বাংলাদেশে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প না হলেও পৃথিবীর অনেক স্থানে ভূমিকম্প খুব সাধারণ ঘটনা, যেমন জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চল। বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ভারতে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এমনকি মহাসাগরের তলদেশে কয়েক কিলোমিটার পানির নিচেও আগ্নেয়গিরি আছে এবং তা থেকে অগ্ন্যুপাতও হচ্ছে। ভূতত্ত্ববিদেরা গবেষণা করে দেখেছেন, ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির সঙ্গে টেকটোনিক প্লেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেসব স্থানে দুটি প্লেট আলাদা হয়েছে (প্লেট সীমানা), দেখা গেছে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি সেসব স্থানেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি একটি করে ডট (.) দিয়ে নির্দেশ করলে দেখা যাবে যে তা বিভিন্ন প্লেটের মধ্যে অবস্থিত সীমানার সঙ্গে মিলে যায়।

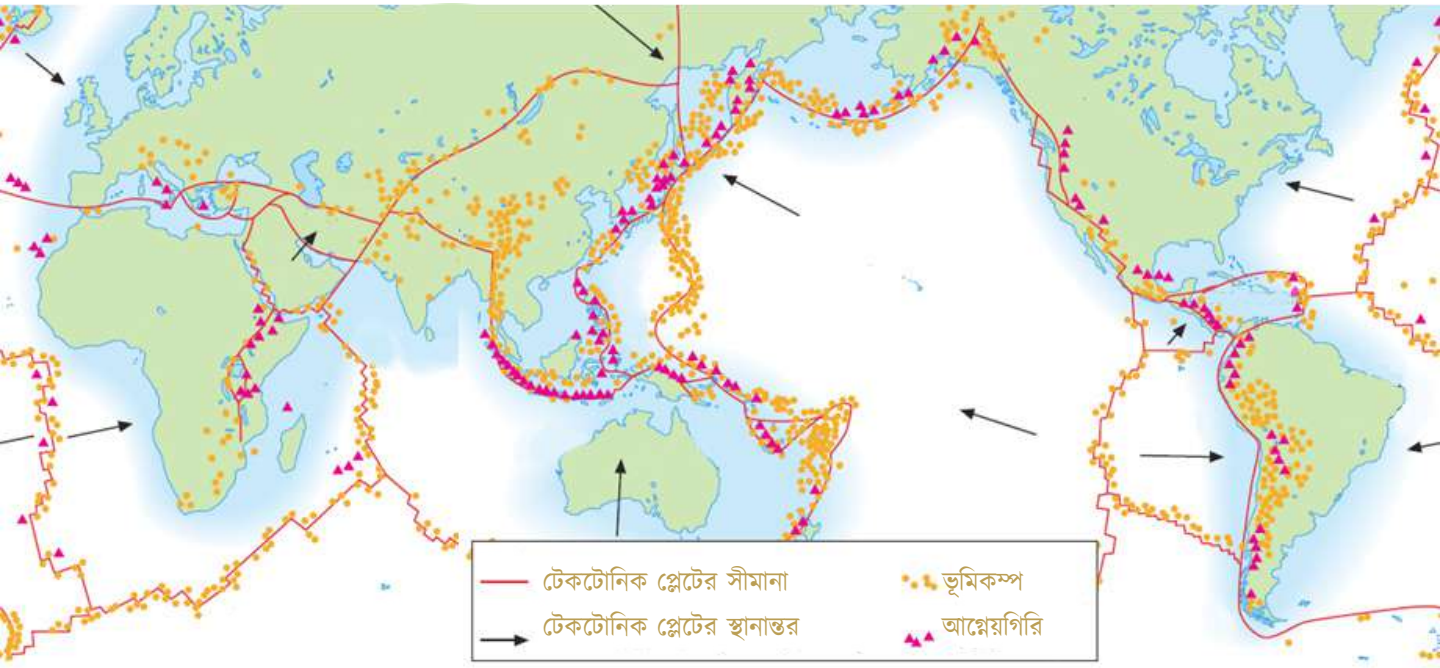

টেকটোনিক প্লেটের সীমানা কালো রেখা, ভূমিকম্পের স্থান লাল ডট এবং আগ্নেয়গিরির স্থান নীল ডট দিয়ে দেখানো হয়েছে।

যেহেতু প্লেটের গতি অতি অল্প তাই দীর্ঘ সময় ধরে দুটি প্লেটের সীমানাতে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয়। যখন প্লেটের সীমানা আর সেই শক্তি ধরে রাখতে পারে না, তখন তা ভূমিকম্প সৃষ্টি করে নিঃসৃত হয়। এটি বেশি হয় যখন একটি প্লেটে অপর একটি প্লেটে ঘেঁষে গতিশীল থাকে বা সরতে থাকে। আবার যখন একটি প্লেট অপর একটি প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষ করে অথবা একটি অপরটি থেকে দূরে সরতে থাকে, তখন সেই সকল প্লেট সীমানাতে ভূমিকম্প ছাড়াও আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়। আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশেও অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে বড় টেকটোনিক প্লেট প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের উপর অবস্থিত। এই প্লেটের চারপাশের সীমানা বরাবর অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি রয়েছে যা একত্রে মানচিত্রে দেখতে পুঁতির মালার মতো মনে হয়। আগ্নেয়গিরিপ্রবণ এই এলাকাকে তাই বলা হয় "প্রশান্ত অগ্নিমালা" (Pacific ring of fire)।

বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে টেকটোনিক প্লেটগুলোর সময়ের সঙ্গে বিবর্তন

বাংলাদেশে কোনো আগ্নেয়গিরি না থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়ে থেকে। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন, টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে বাংলাদেশের অবস্থান। টেকটোনিক গঠনগত দিক দিয়ে ইন্ডিয়ান প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট এবং বার্মিজ মাইক্রো প্লেটের সংযোগস্থল বাংলাদেশ এবং তার

কাছাকাছি এলাকায় পড়েছে। এ জন্য বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ এমনকি ঢাকা শহরেও বছরে এক বা একাধিক ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে।

প্লেট সীমানাতে অনেকগুলো চ্যুতিরেখা বা Fault Line থাকে। এসব চ্যুতিরেখা বরাবর যে ভূমিকম্প হয় তা নির্ভর করে মূলত প্লেটের গতি এবং সর্বশেষ কত সময় আগে ভূমিকম্প হয়েছে তার উপর। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে প্লেট সীমানায় অবস্থিত চ্যুতিরেখায় শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। বাংলাদেশের ভেতর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেসব চ্যুতিরেখা সক্রিয় রয়েছে, সেগুলো যেকোনো সময় মাঝারি থেকে শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। এই চ্যুতিরেখাগুলো হচ্ছে, ডাউকি চ্যুতি রেখা, শিলং মালভূমি, মধুপুর চ্যুতি, আসাম-সিলেট চ্যুতি এবং চট্টগ্রাম-মিয়ানমার প্লেট সীমানার চ্যুতি।

ভূমিকম্পের পরিমাপ

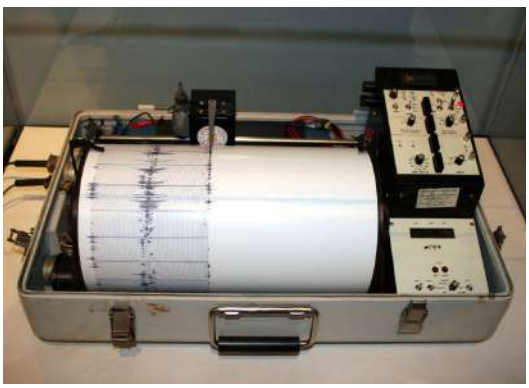

সিসমোগ্রাফ

আমাদের দেশের ভূমিকম্প নিয়ে সাধারণ মানুষের একটি ভুল ধারণা আছে। যখন ভূমিকম্প হয়, তখন বেশির ভাগ মানুষের ধারণা হয় সেটি বুঝি ঠিক তার পায়ের নিচে ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ সময় সেটি কয়েকশত কিলোমিটার কিংবা আরো দূরে কোথাও ঘটে এবং দূর থেকে তার কম্পনটি আমরা অনুভব করি। তোমরা যারা তোমাদের জীবনে কখনো ভূমিকম্প অনুভব করেছ, তারা সবাই লক্ষ করেছ, তখন মনে হয় পায়ের নিচের মাটি নড়ছে বা কাঁপছে। আসলেই তখন মাটি কাঁপতে থাকে এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে কতদূরে মাটি কতটুকু কতটুকু কাঁপে তার পরিমাণ থেকে ভূমিকম্পের মাত্রাটির পরিমাপ করা হয়। এই সহজ এবং প্রচলিত পদ্ধতির নাম রিখটার স্কেল। আমরা যদি ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ১০০ কিলিমিটার দূরে থাকি এবং সেখানে বসে ভূমিকম্প চলাকালীন আনুমানিক ১০০ মিমি (বা ১০ সেন্টিমিটার) বিস্তৃত কম্পন অনুভব করি, তাহলে সেটাকে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প বলা হয়। যে যন্ত্র দিয়ে দিয়ে এই ধরনের ভূ-কম্পন মাপা হয় সেটিকে সিসমোগ্রাফ বলে।

রিখটার স্কেলে ৫ মাত্রার ভূমিকম্পহচ্ছে মাঝারি (Moderate) ভূমিকম্প। এর থেকে কম মাত্রার ভূমিকম্প হলে সেভাবে অনুভব করা যায় না। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প ১ মাত্রা বেড়ে গেলে কম্পন ১০ গুণ বেড়ে যায়! কাজেই ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের কম্পন ৫ মাত্রার কম্পন থেকে ১০ গুণ বেশি এবং সেটি বড় (Strong) ভূমিকম্প। আবার ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের চাইতেও ১০ গুণ বেশি কম্পন হয় কাজেই সেটি গুরুতর (Major) ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের প্রস্তুতি নেওয়া না থাকার কারণে ২০১০ সালে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে হাইতিতে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। ৮ মাত্রার ভূমিকম্প ৭ মাত্রা থেকে ১০ গুণ বেশি কম্পন হয়, কাজেই সেটাকে বিশাল অথবা ভয়াবহ (Great) ভূমিকম্প বলা যায়। পৃথিবীতে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের উদাহরণ খুব বেশি নেই। ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে পুরো জনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনেক উদাহরণ যেরকম আছে, আবার ভূমিকম্পের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কারণে ২০১৪ সালে চিলিতে মাত্র ছয়জন লোক মারা গিয়েছিল, সেই উদাহরণও আছে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে আমরা যত দূরে থাকবো আমরা তত কম কম্পন অনুভব করব। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় ৫ মাত্রার একটা ভূমিকম্প ১০০ কিলোমিটার থেকে যতটুকু কম্পন পাওয়া যায়, ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের বেলায় ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে থেকে সেই একই পরিমাণ কম্পন অনুভব করা যাবে।

ভূমিকম্পের সময় বিস্তৃত এলাকায় টেকটনিক সীমানা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি বের হয়ে আসে। হিরোশিমাতে যে নিউক্লিয়ার বোমাটি ফেলা হয়েছিল একটি ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে সেই পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। তোমরা জেনেছ, রিখটার স্কেলে প্রতি মাত্রায় কম্পন ১০ গুণ করে বেড়ে যায়, কিন্তু নির্গত শক্তির পরিমাণ প্রতি মাত্রায় বেড়ে যায় প্রায় ৩২ গুণ! অর্থাৎ ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্পে যে পরিমাণ শক্তি বের হয় ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে নির্গত শক্তি তার থেকে ১০০০ গুণ বেশি! কাজেই ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ১০০০টি হিরোশিমায় ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার বোমার সমান শক্তি বের হয়।

ভূমিকম্পে নিরাপত্তা

ভূমিকম্প এমন একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোনো একটি দেশ বা অঞ্চল পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে। এমনকি বড় ভূমিকম্প নদীর গতিপথও পরিবর্তন করতে পারে। ১৭৬২ সালে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে আমাদের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ বদলে গিয়েছিল। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের ভূমিকম্প না হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

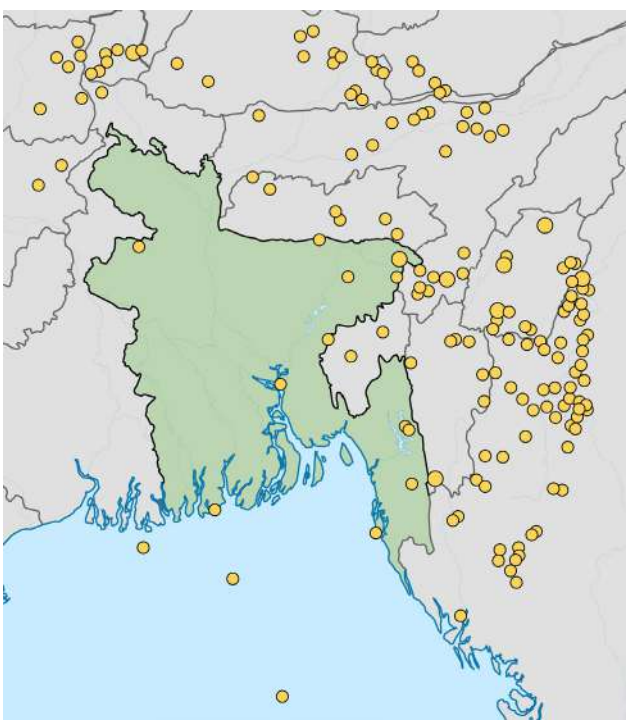

পাশের ছবিতে বাংলাদেশ এবং তার আশপাশের ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পগুলো দেখানো হয়েছে। ছবিতে নিশ্চয়ই দেখছ, বাংলাদেশের ভেতরে সাম্প্রতিককালে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি, শুধু আশপাশের দেশে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পন অনুভূত হয়েছে। যেহেতু অতীতে এই অঞ্চলে বড় ভূমিকম্প হয়েছে, তাই আমাদের ধরে নিতে হয় ভবিষ্যতেও হতে পারে। সেটি কখন হবে যেহেতু আমাদের জানা নেই, তাই সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে।

বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো ভূমিকম্পের জন্য আগে থেকে কোনো সতর্ক বার্তা পাওয়া সম্ভব নয়। এটি যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে আঘাত হানতে পারে, তাই ভূমিকম্পের জন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। ভূমিকম্পের বেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিয়ম মেনে ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করা। আমাদের দেশে যে সকল বড় বড় দালান-কোঠা তৈরি করা হয়, সেখানে অবশ্যই

ভূমিকম্প প্রতিরোধক নীতিমালা মেনে তৈরি করতে হবে। তা না হলে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। সাধারণভাবে ভূমিকম্পের নিরাপত্তার জন্য নিচের বিষয়গুলো মেনে চলা যেতে পারে।

ভূমিকম্পের আগে

১. বাসায় আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
২. প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, শুকনা খাবার এবং পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. বাসায় গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি এবং পানির সরবরাহ কীভাবে বন্ধ করতে হয় সেটি জেনে রাখতে হবে।

ভূমিকম্পের সময়

১. আমাদের দেশে প্রায় সব সময়েই আমরা শত শত কিলোমিটার দূরের কোনো ভূমিকম্পের রেশ অনুভব করে থাকি। কাজেই কোনো অবস্থাতেই অহেতুক ভয়ে এবং আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া যাবে না। মাথা ঠান্ডা রাখলে বড় ভূমিকম্পের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

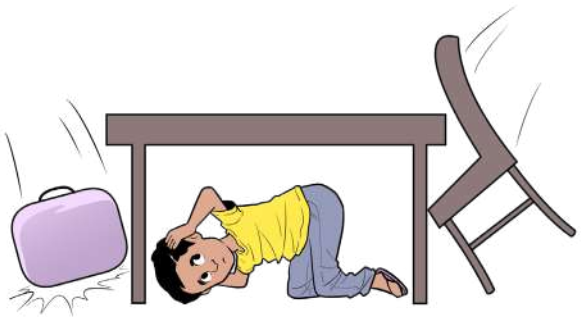

শক্ত টেবিলের নীচে আশ্রয় নাও।

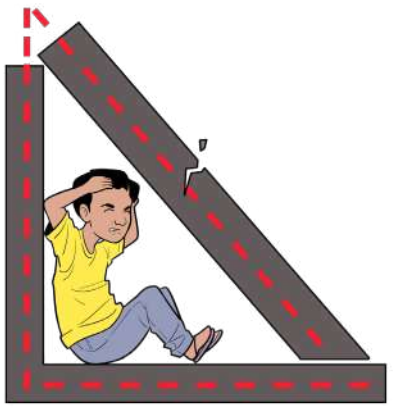

অথবা ঘরের কোণায় চলে যাতে কিছু ভেঙ্গে পড়লে সরাসরি গায়ের ওপরে না পড়ে একটা ত্রিভূজাকৃতির জায়গা থেকে যায় তোমার ওপর।

বাইরে থাকলে আতংকিত না হয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

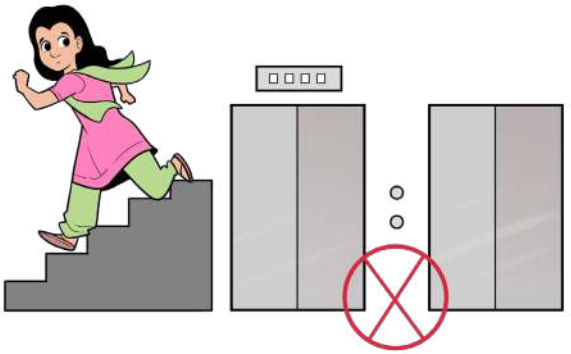

বিল্ডিং থেকে একান্ত নামতে চাইলে সিঁড়ি দিয়ে নামাই নিরাপদ।

২. যদি ভূমিকম্পটি একটি বড় ভূমিকম্প হয়, তুমি যদি ঘরের ভেতরে থাকো, তাহলে ভিতরেই থাকো, বাইরে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। কখনোই লিফট দিয়ে নামার চেষ্টা কোরো না। কাচের জানালা থেকে দূরে থাকো এবং দেয়ালের পাশে দাড়াও। প্রয়োজনে শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও।

৩. তুমি যদি ঘরের বাইরে থাকো, তাহলে বাইরেই থাকো, ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা কোরো না। ইলেকট্রিক পোল কিংবা বড় বিল্ডিং থেকে দূরে সরে যাও, উপর থেকে মাথার উপর কিছু পড়তে পারে।

৪. কোনোভাবেই ম্যাচ জ্বালিও না, গ্যাস পাইপ ভেঙে বাতাসে গ্যাসের মিশ্রণ আগুনের জন্যে খুবই বিপজ্জনক।

ভূমিকম্পের পরে

১. বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকলে এবং কেউ আহত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দাও। গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নাও, তবে মনে রেখো সত্যিকারের বড় ভূমিকম্প হলে হাসাপাতালে অসংখ্য মানুষকে জরুরি চিকিৎসা দিতে হয়। কাজেই হাসপাতালে যার প্রয়োজন বেশি তাকে আগে চিকিৎসা দেয়া হবে।

২. পানি, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস লাইন পরীক্ষা করো, যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সরবরাহ বন্ধ করে দাও। বাসায় গ্যাসের গন্ধ পেলে ঘরের দরজা-জানালা খুলে ঘরের বাইরে যাও।

৩. রেডিওতে খবর শোনার চেষ্টা করো। টেলিফোন খুব কম ব্যবহার করবে। জরুরি কাজের জন্য ত্রাণ বাহিনীকে টেলিফোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে দাও।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের বাইরে থেকো। ভাঙা কাচ ইত্যাদিতে যেন পা কেটে না যায়, সে জন্য খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করবে না।

৬. ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংয়ের নিচে আটকা পড়লে উদ্ধারকারী দল এলে তাদের সংকেত দেয়ার জন্য কোনো কিছুতে নিয়মিতভাবে আঘাত দিয়ে শব্দ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করো।

৭. বড় ভূমিকম্প হলে পরে, আফটার শক হিসেবে আরো ভূমিকম্প হতে পারে, সে জন্যে প্রস্তুত থেকো।

অনুশীলনী ?

১। ভূমিকম্প চলাকালীন সময় তুমি একটি উঁচু বিল্ডিংয়ের নিচে থাকলে নাকি উঁচুতে থাকলে বেশি কম্পন অনুভব করবে?

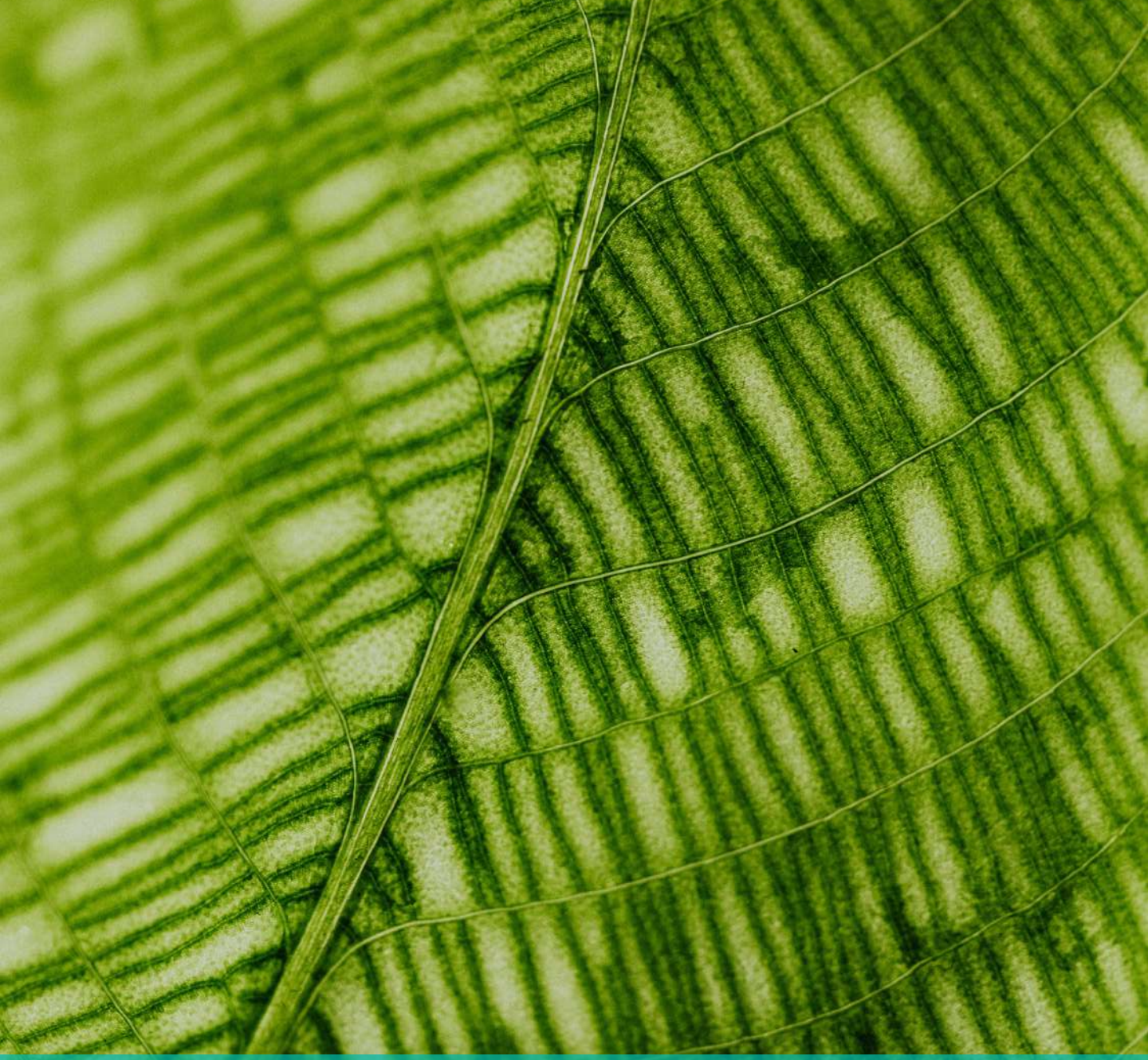

অধ্যায় ১২

জীবে শক্তির প্রবাহ

অধ্যায় ১২ জীবে শক্তির প্রবাহ

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন
- ☑ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা
- ☑ সালোকসংশ্লেষণের স্থান
- ☑ সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব
- ☑ শ্বসনকালে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণ
- ☑ মানুষের শ্বসন
- ☑ শ্বসনের গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন

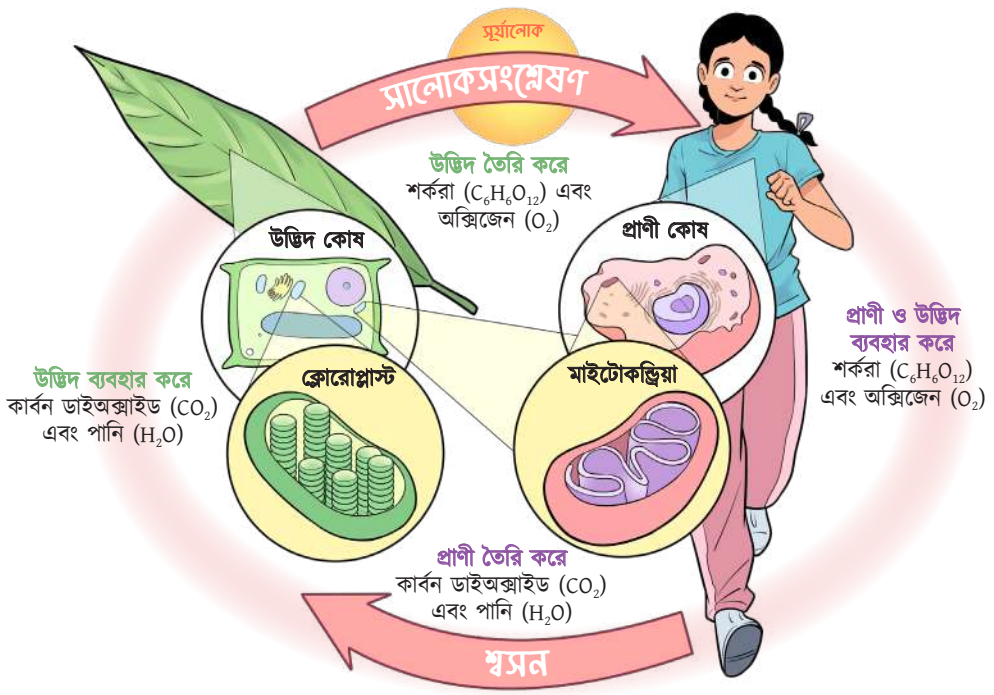

সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে পুরো জীবজগৎ

পৃথিবীর এই যে বিচিত্র জীবজগৎ, তা টিকে থাকার জন্য দরকার হয় শক্তির। এই শক্তি কোথা থেকে আসে জানো? পৃথিবীর সব শক্তি আসে সূর্য থেকে। যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলোকরশ্মি পৃথিবীর অসংখ্য জীবকে টিকিয়ে রাখতে, তাদের শক্তি যোগাতে সাহায্য করে তার নাম সালোকসংশ্লেষণ বা Photosynthesis। পৃথিবীর জীবজগতের জন্য সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই সূর্যের আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বড় বড় জৈব অণুর মধ্যে, বিশেষ করে কার্বোহাড্রেট বা শর্করা হিসেবে জীবের কোষের মধ্যে জমা হয়।

কিন্তু শক্তি তো শুধু জমা করলেই হবে না, জীবের নানান কাজে সেই শক্তিকে ব্যবহারও করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শর্করা (Carbohydrate) ভেঙে কোষের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার উপযোগী শক্তিরূপে পরিণত করে আরেকটি প্রক্রিয়া। এর নাম শ্বসন (Respiration)।

প্রকৃতিগত দিক থেকে সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রায় বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া। কারণ, একটিতে শক্তি সঞ্চিত হয়, আরেকটিকে সঞ্চিত শক্তি ভেঙে কোষের ব্যবহার উপযোগী রূপে নেওয়া হয়। তবে মনে রাখতে হবে, সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন প্রক্রিয়ার বিক্রিয়াগুলো হুবহু বিপরীত কিছু নয়। সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়া দুটি তুলনা করলে পৃথিবীতে সমস্ত জীব যে সংযুক্ত সেটা বোঝা যায়। সালোকসংশ্লেষণে অংশ নেওয়া উপকরণগুলো শ্বসনের কাঁচামাল, আর শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত উপাদান ব্যবহৃত হয় সালোকসংশ্লেষণে। উভয় প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে যে পদার্থগুলো অংশগ্রহণ করে থাকে, সেগুলো হলো কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন।

বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণায় এই দুটো প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে, এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত একাধিক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের মধ্যে মেলভিন কেলভিন, রবার্ট হুবার, হ্যান্স ক্রেবস, অটো ওয়ারবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)

সালোকসংশ্লেষণ শব্দটিকে যদি আমরা ভাঙি, তবে পাওয়া যায়: স+আলোক+সংশ্লেষণ। সংশ্লেষণ শব্দটির অর্থ তৈরি করা বা হওয়া। তার মানে, আলোর উপস্থিতিতে যে সংশ্লেষণ হয়, তাকেই আমরা সালোকসংশ্লেষণ বলতে পারি। ইংরেজিতেও কিন্তু বিষয়টা এমনই বুঝায়। সালোকসংশ্লেষণ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Photosynthesis শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ photos (অর্থ: আলোক; এখানে সূর্যালোক) ও synthesis (অর্থ: সংশ্লেষণ বা তৈরি করা) এর সমন্বয়ে গঠিত। এক কথায় বলা যায়, সালোকসংশ্লেষণ বা Photosynthesis-এর অর্থ: সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রাসায়নিক সংশ্লেষণ।

কী ঘটে এ সময়ে? কোন কোন রাসায়নিক উপাদান বা কাঁচামাল অংশ নেয় কিংবা তৈরি হয় এই প্রক্রিয়ায়? কোথায় সংঘটিত হয় জীবজগতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রক্রিয়া? নিচের আলোচনায় আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

সালোকসংশ্লেষণ এর বিক্রিয়া

সালোকসংশ্লেষণ হচ্ছে একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা সবুজ উদ্ভিদ এবং কিছু বিশেষ অণুজীবের (যেমন: সবুজ শৈবাল, সায়ানোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি) কোষে সংঘটিত হয়। প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত কয়েক ধাপে সম্পন্ন হয়:

১. বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) উদ্ভিদের পাতায় প্রবেশ করে;
২. উদ্ভিদের মূল দ্বারা শোষিত পানি পরিবাহিত হয়ে পাতায় পৌঁছায়;
৩. পাতার কোষের বিশেষ অঙ্গাণু ক্লোরোপ্লাস্টে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে, CO_2 ও পানির মধ্যে বিক্রিয়া হয় এবং জটিল কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় অণু তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন প্রকৃতিতে নির্গত হয়।

সুতরাং পুরো বিষয়টিকে এভাবে বলা যায়- সূর্যের শক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং পানির মধ্যে বিক্রিয়ায় শর্করা ও অক্সিজেন তৈরির প্রক্রিয়াটিই সালোকসংশ্লেষণ। খুব ছোট সহজ একটি বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি দেখানো যায়,

$$CO_2 + H_2O + \text{আলো} \rightarrow [CH_2O] + H_2O + O_2$$

এখানে ডান পাশে CH_2O দ্বারা কার্বহাইড্রেটকে বুঝানো হয়েছে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় সেটি খুব সহজ একটি পরীক্ষণ বা experiment-এর মাধ্যমে দেখানো যায়।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ: একটা বিকার, একটা ফানেল, একটা টেস্টটিউব, পানি, সতেজ জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলা ও একটা দিয়াশলাই।

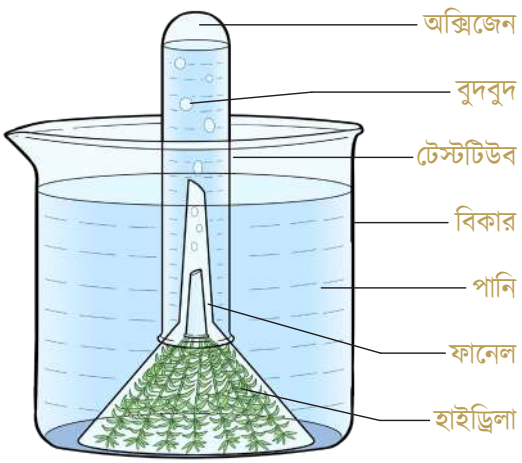

পরীক্ষণ পদ্ধতি: বিকারটির দুই-তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করি। সতেজ হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলো বিকারে পানিতে রেখে ফানেল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিই যেন হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ড ফানেলের নলের উপরের দিকে থাকে। এরপর বিকারে আরও পানি ঢালি যেন ফানেলের নলটা সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডুবে যায়। এবার টেস্টটিউবটা পানি দিয়ে পূর্ণ করে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে ফানেলের নলের উপর এমনভাবে উল্টিয়ে দিই, যেন টেস্টটিউবের পানি বের না হয়ে যায়। এরপর সব কিছুকে সূর্যালোকে রাখি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাবে হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ডের প্রান্ত দিয়ে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয়ে টেস্টটিউবে জমা হচ্ছে এবং টেস্টটিউবের পানি নিচে নেমে যাচ্ছে। টেস্টটিউবটা প্রায় সম্পূর্ণটা গ্যাসে পূর্ণ হলে, দিয়াশলাইয়ের একটা

সদ্য নিভন্ত কাঠি টেস্টটিউবের মুখে প্রবেশ করলে, নিভন্ত কাঠিটি দপ করে জ্বলে উঠবে। দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা কেন দপ করে জ্বলে উঠবে?

আমরা জানি অক্সিজেন এমন একটি গ্যাস যেটি দাহ্য কোনো পদার্থের স্পর্শে এলে তাকে জ্বালিয়ে দেয়। উপরের পরীক্ষায় দিয়াশলাইটি জ্বলে উঠেছে, যা প্রমাণ করে যে বিকারে উৎপন্ন গ্যাসটি হচ্ছে অক্সিজেন।

সালোকসংশ্লেষণের স্থান (Site of Photosynthesis)

সূর্যের আলোর শক্তিকে জৈব রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে এমন জীবে সালোকসংশ্লেষণ হয়। এই তালিকায় কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং শৈবালও আছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উদ্ভিদের সবুজ পাতা, যেখানে সালোকসংশ্লেষণের সবচেয়ে আদর্শ অবস্থাটি পাওয়া যায়। আমরা এখানে কেবল উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের কথাই আলোচনা করব।

চারপাশে তাকালে আমরা যেসব উদ্ভিদ দেখতে পাই, সেগুলোর প্রায় অধিকাংশেরই সবুজ পাতা থাকে। চারপাশে অন্য রঙের পাতাও থাকতে পারে। পাতা হচ্ছে, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের প্রধান অঙ্গ। পাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পৃষ্ঠে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যা দিয়ে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পাতার কোষের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। এই ছোট ছোট ছিদ্রকে পত্ররন্ধ্র (stomata) বলে। পত্ররন্ধ্রগুলো এক ধরনের বিশেষ কোষ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এসব কোষকে বলা হয় গার্ড সেল (Guard cell) বা রক্ষক কোষ।

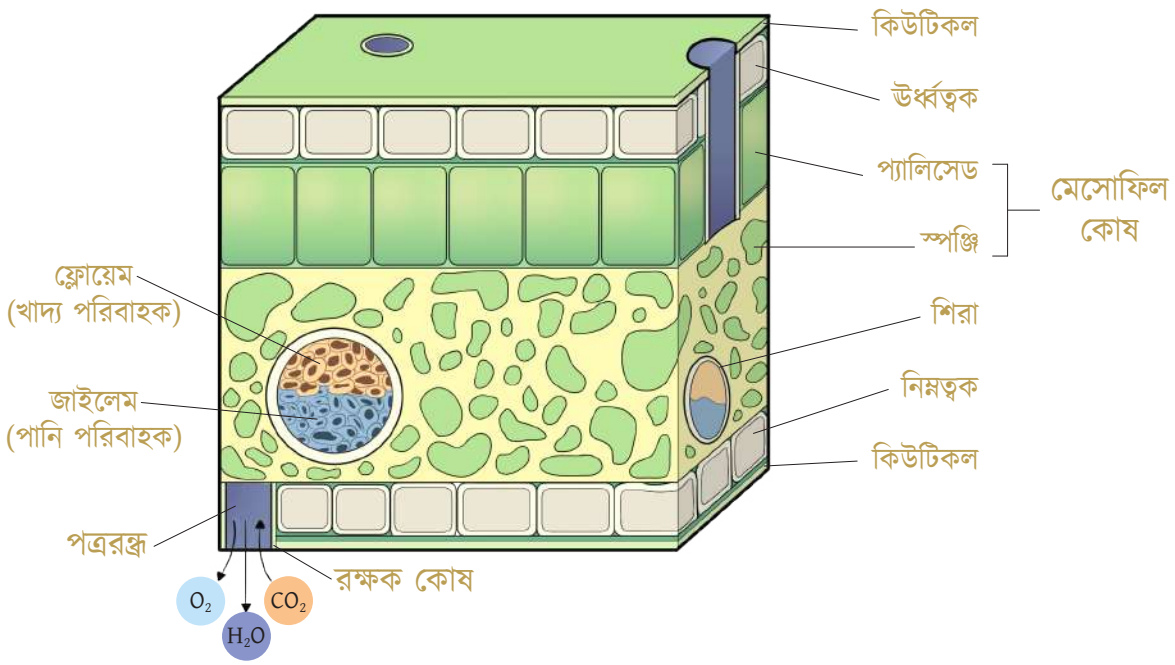

পাতার প্রস্থচ্ছেদ

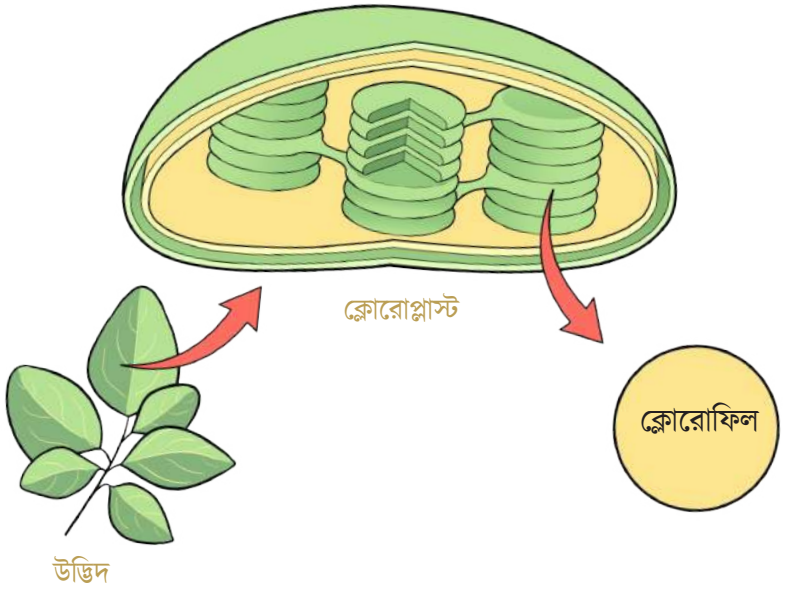

উদ্ভিদে ক্লোরোফিলের উপস্থিতি

গাছের পাতা সবুজ হয় কেন জানো? কারণ, পাতার কোষে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামক এক ধরনের সবুজ কণিকা থাকে। ক্লোরোফিলের উপস্থিতিই পাতার সবুজ রঙের জন্য দায়ী। এই ক্লোরোফিল কণা কিন্তু কোষের ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে না। বরং উদ্ভিদ কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) নামক একটি বিশেষ অঙ্গাণুর মধ্যে অবস্থান করে। ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন বৈশিষ্ট্য এমন যে, এর ভেতরে বিশেষভাবে ভাঁজ হয়ে থাকা দুই স্তরবিশিষ্ট ঝিল্লি (Membrane) রয়েছে। এই ঝিল্লির গায়েই ক্লোরোফিল অণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে সজ্জিত থাকে। এই ক্লোরোপ্লাস্ট-এর উপস্থিতি হচ্ছে উদ্ভিদ কোষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রাণী কোষে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। ক্লোরোফিলসমৃদ্ধ সবুজ পাতাই উদ্ভিদের প্রধান সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গ। তবে পাতা ছাড়াও যে কোনো সবুজ সজীব কোষে অর্থাৎ সবুজ কাণ্ডে (ফণীমনসা, লাউ, কুমড়া, পুঁই ইত্যাদি), ফুলের সবুজ বৃতিতে, অর্কিড মূলের সবুজ অংশে সালোকসংশ্লেষণ হতে পারে।

সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণ হলো উদ্ভিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করে। জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে সংক্ষেপে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

১. পৃথিবীর শক্তির উৎস সূর্য থেকে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে।

২. খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে উক্ত শক্তি সকল জীবে সঞ্চারিত হয়।

৩. পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুত হয় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়।

৪. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় CO_2 ও O_2 অনুপাত ঠিক রাখতে সালোকসংশ্লেষণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫. মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান যেমন কয়লা, পেট্রোল, রেয়ন, কাগজ, রাবার, ওষুধ ইত্যাদি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফল।

শ্বসন (Respiration)

প্রতিটি জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়ার জন্য শক্তি প্রয়োজন। এই শক্তি কিন্তু আসে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলো থেকে। আমাদের খাবারের মধ্যে থাকা শর্করা, প্রোটিন ও লিপিড অণুতে শক্তি সঞ্চিত থাকে। শরীরে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে খাদ্যের মধ্যে থাকা এই শক্তিকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া হচ্ছে শ্বসন। এই গতিশক্তি ও তাপশক্তির দ্বারা জীব খাদ্য গ্রহণ, চলন, রেচন, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

শ্বসন একটি বিপাকীয় ক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া চলাকালে বেশিরভাগ জীব পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। তবে সরল শ্রেণির কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী অক্সিজেন ছাড়া শ্বসনক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যে শ্বসন সম্পন্ন হয়, তাকে সবাত শ্বসন (Aerobic respiration) বলে। অপরদিকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতে সম্পন্ন শ্বসন প্রক্রিয়াকে অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration) বলে।

উভয় প্রকার শ্বসনের ক্ষেত্রেই কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষে দিন রাত সব সময় শ্বসন কার্য ঘটে চলে।

আমরা মানুষ যে অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারি না, তার মূল কারণ আমাদের শক্তি উৎপাদন অক্সিজেন ছাড়া সম্ভব নয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আমাদের গ্রহণ করা খাবার জারিত (খাবারের রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া) হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং একই সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষে থাকা খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের উপস্থিতি (বা অনুপস্থিতিতে) জারিত হয়ে খাদ্যে থাকা রাসায়নিক শক্তিকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত ও মুক্ত করে। ফলশ্রুতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয় তাকে শ্বসন বলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন সজীব কোষে শ্বসন প্রক্রিয়াটি মূলত একই। কিন্তু বিভিন্ন জীবের অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন পদ্ধতিটি ভিন্নরূপ। উদ্ভিদ দেহে শ্বসনকালে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত সরল। উদ্ভিদের কোনো নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ নেই। পাতার পত্ররন্ধ্র, কাণ্ডের ছিদ্রপথ এবং অন্তঃকোষের মাধ্যমে বায়ু উদ্ভিদ দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

প্রাণীর দেহেও শ্বসন, বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নানাভাবে সম্পন্ন হয়। সরল প্রাণীতে প্রধানত ত্বক ও শ্বাসনালির মাধ্যমে শ্বসন হয়। উন্নত প্রাণীর শ্বসনে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময়ের জন্য বিশেষ ধরনের শ্বসন অঙ্গ আছে। যেমন মাছ ও ব্যাঙাচি ফুলকার সাহায্যে এবং স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী ফুসফুসের সাহায্যে শ্বসন সম্পন্ন করে।

শ্বসনকালে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণ শ্বসনে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা পরের পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

শ্বসনকালে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণ

পরীক্ষার উপকরণ: দুটি থার্মোফ্লাস্ক, দুটি থার্মোমিটার, অঙ্কুরিত ছোলাবীজ, পানিতে সিদ্ধ ছোলাবীজ ও ছিদ্রযুক্ত রাবারের ছিপি।

পরীক্ষণ পদ্ধতি: অঙ্কুরিত ছোলাবীজগুলাকে একটি থার্মোফ্লাক্সের মধ্যে রেখে একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়ে মুখটি বন্ধ করতে হবে। এরপর ছিপির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার এমনভাবে প্রবেশ করতে হবে, যেন থার্মোমিটারের নিচের প্রান্তটি অঙ্কুরিত ছোলাবীজগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। অনুরূপভাবে অপর থার্মোফ্লাস্কটিতে সিদ্ধ ছোলাবীজগুলোকে রাখতে হবে এবং অপর থার্মোমিটারটি স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি থার্মোমিটারের পারদ তাপমাত্রার অবস্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

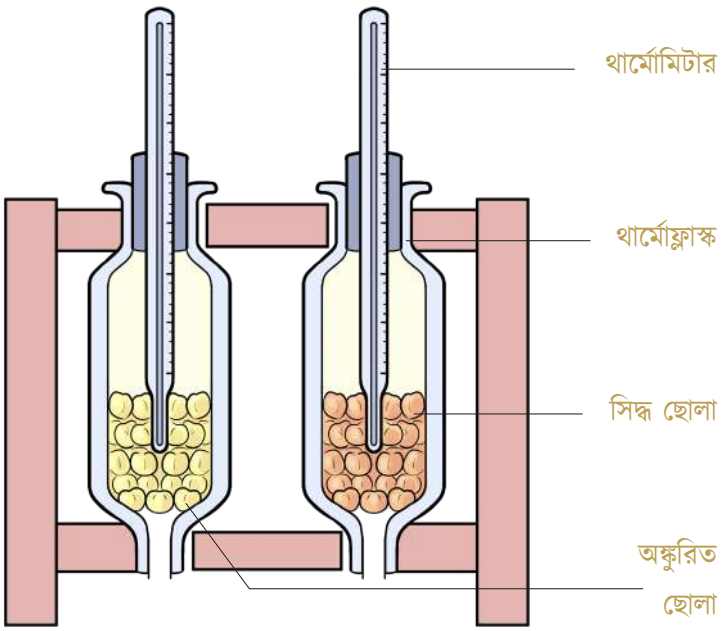

থার্মোমিটার পর্যবেক্ষণ:
কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে জীবন্ত অঙ্কুরিত ছোলাবীজযুক্ত থার্মোফ্লাস্কের উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটায় থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটেছে। সিদ্ধ বীজযুক্ত থার্মোফ্লাস্কের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয়নি অর্থাৎ এই থার্মোফ্লাস্কে রাখা থার্মোমিটারের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত আছে।

সিদ্ধ ছোলাগুলোর কোষগুলো জীবিত নয়। ফলে সেখানে শ্বসন প্রক্রিয়া চলছে না। অপরদিকে জীবিত ছোলাগুলোতে জীবন্ত কোষে শ্বসন প্রক্রিয়া চলছে। সেখানে উৎপন্ন তাপশক্তি তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জীবন্ত কোষে শ্বসন প্রক্রিয়ার ফলে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়।

মানুষের শ্বসন

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, শীতকালে যখন আমাদের নাক ও মুখ থেকে শ্বাস ছেড়ে দেই, তখন আমরা হালকা ধোঁয়ার মতো বাতাস বের হতে দেখি। আমরা যখন শ্বাস ছাড়ি তার সাথে আমাদের ফুসফুস থেকে জলীয় বাষ্প যোগ হয়। শীতের সময়ে এই শ্বাসের সাথে বের হয়ে আসা জলীয় বাষ্প বাইরের কম তাপমাত্রায় ছোট ছোট পানির কনায় পরিণত হয়, যা আমরা ধোঁয়ার মতো দেখি। আমরা সাধারণত নাক দিয়ে বাতাস নিই, আবার ছেড়ে দিই। আমাদের বুক হাঁপরের মতো অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এতে ফুসফুসের আয়তন বাড়ে ও কমে। বুকে হাত দিলেই বিষয়টি টের পাবে। গভীরভাবে শ্বাস নাও আবার ছেড়ে দাও। এটিই মূলত তোমার শ্বসন প্রক্রিয়ার একটি দৃশ্যমান ধাপ। তবে কোষের ভেতরে সংঘটিত শ্বসন প্রক্রিয়ার অংশটুকু কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। কেবল পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি।

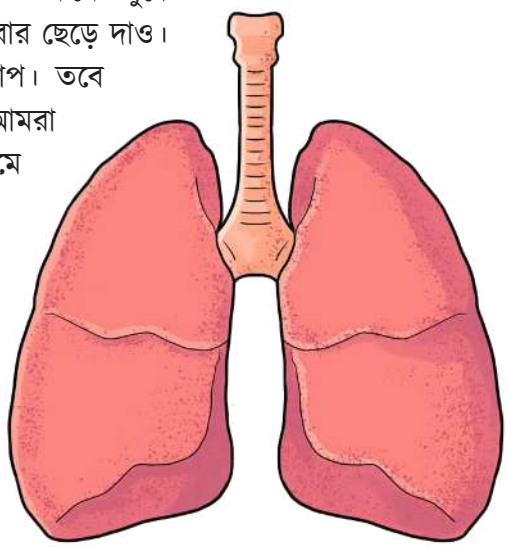

ফুসফুস

ফুসফুস অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। এভাবে অবিরত অক্সিজেন নেওয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করা শ্বাসক্রিয়া নামে পরিচিত। এটা শ্বসনের একটি ধাপ। শ্বসন প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ১. বহিঃশ্বসন ও ২. অন্তঃশ্বসন।

১. বহিঃশ্বসন: যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে, তাকে বহিঃশ্বসন বলে। এ পর্যায়ে ফুসফুস ও রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে। বহিঃশ্বসন দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা (i) প্রশ্বাস বা শ্বাস গ্রহণ: পরিবেশ থেকে আমরা যে অক্সিজেনযুক্ত বায়ু গ্রহণ করি, একে শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস বলে। (ii) নিশ্বাস: প্রশ্বাসের পর পরই নিঃশ্বাস পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে আমাদের ফুসফুস আয়তনে ছোট ও সংকুচিত হয়। ফলে বায়ুথলির ভিতরের বায়ু, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ফুসফুস থেকে পরিবাহিত হয়ে নাক দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

২. অন্তঃশ্বসন: অন্তঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় দেহের কোষের মধ্যকার খাদ্য অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত (Oxidized) হয়ে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে পরিণত হয়। ফুসফুসের রক্তে যে অক্সিজেন প্রবেশ করে, তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারপর এটি কোষের ভিতরের খাদ্যের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে শক্তি উৎপন্ন করে। এর ফলে তাপশক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে ফুসফুসে ফেরত আসে।

শ্বসনের গুরুত্ব

শ্বসন প্রক্রিয়াটি জীবের শক্তি ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য একটি জীবের শক্তি প্রয়োজন এবং ওই শক্তি শ্বসন থেকে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অপসারিত কার্বন ডাইঅক্সাইড সালোকসংশ্লেষণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয়।

এই প্রস্তুত খাদ্য সমগ্র জীবজগতের জীবন রক্ষা করে। শ্বসন প্রক্রিয়া আমাদের কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ায় কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে আমাদের শরীরের ভারমাস্য নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়ি।

অনুশীলনী ?

১। সালোকসংশ্লেষণ না থাকলে পৃথিবীটা কী রকম হতো?

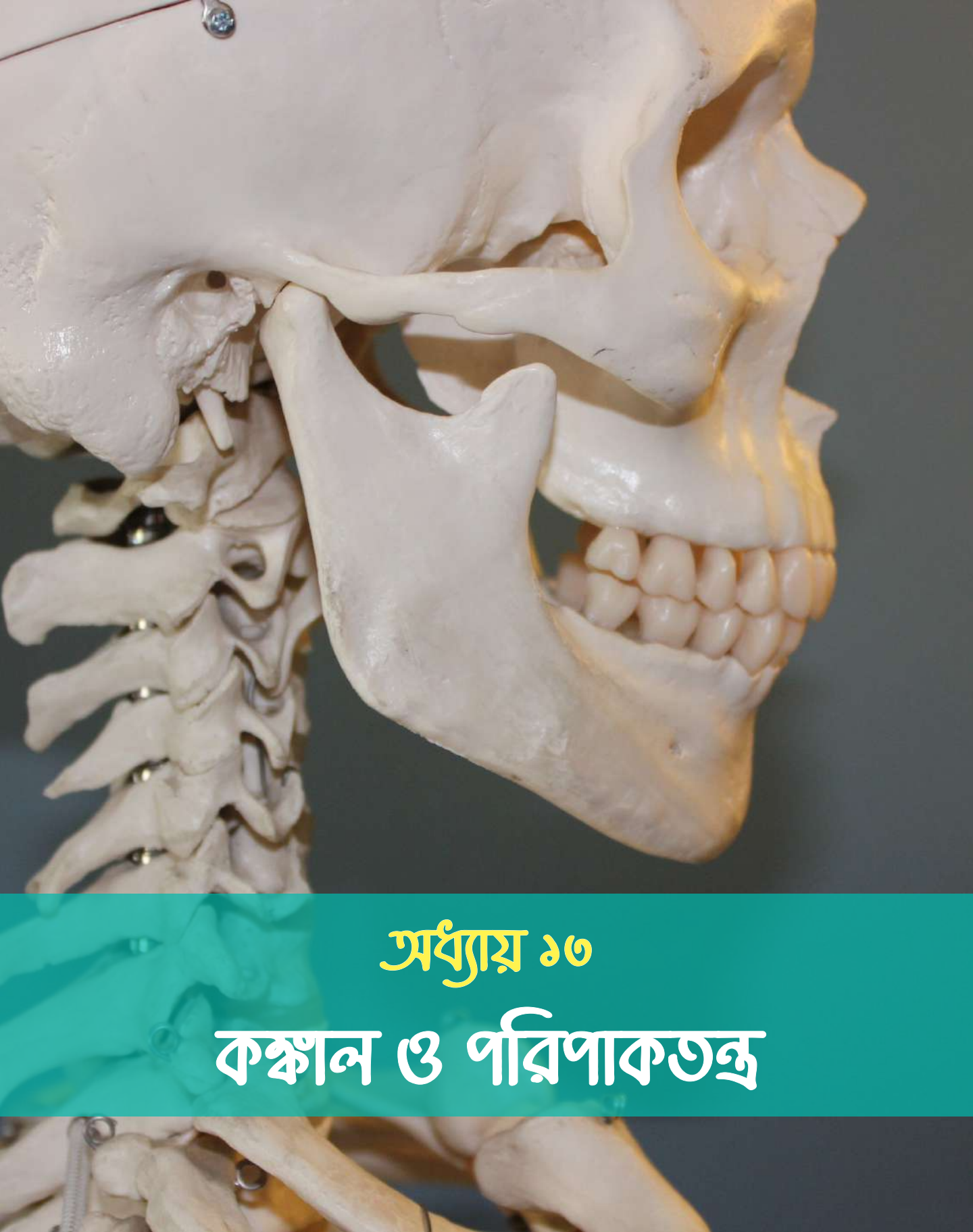

অধ্যায় ১৩

কঙ্কাল ও পরিপাকতন্ত্র

অধ্যায় ১৩ কঙ্কাল ও পরিপাকতন্ত্র

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ কঙ্কালতন্ত্র
- ☑ অস্থি বা হাড়
- ☑ অস্থিসন্ধি
- ☑ কঙ্কালতন্ত্রের কাজ
- ☑ পরিপাকতন্ত্র
- ☑ পরিপাকগ্রন্থি ও সেগুলোর কাজ
- ☑ খাদ্য পরিপাকসংক্রান্ত কিছু সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার
- ☑ পরিপাকতন্ত্রের যত্ন

আমাদের দেশে যারা তোমাদের মতো স্কুলে লেখাপড়া করে, তাদের একেকজনের স্কুল একেক রকম। কোনোটি ব্যস্ত শহরের মাঝখানে, কোনোটি গ্রামের নিরিবিলি পরিবেশে। কারো স্কুল অনেক বড় দালান, কারো স্কুল ছোট কয়েকটি ঘর। কিন্তু তোমরা কি ভালো করে খেয়াল করেছ, কীভাবে স্কুলের ঘর বা বিল্ডিংটি তৈরি হয়েছে? কারা স্কুলটিকে চালিয়ে রেখেছে?

যেকোনো ভবন তৈরি হয় একটি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে।

খোঁজ করলে জানতে পারবে, একটি স্কুলঘর তৈরির জন্য সবার আগে দরকার হয় একটি কাঠামোর। পাকা ঘর হলে লোহা বা ইস্পাতের শক্ত রড দিয়ে ওই কাঠামো তৈরি করা হয়। এরপর এই কাঠামোর সঙ্গে ইট, সুরকি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ধারাবাহিকভাবে এরপর দেয়াল তৈরি হয়, ছাদ, দরজা-জানালা ইত্যাদি তৈরি হয়। কাঁচা বা আধাপাকা ঘর হলে কখনো বাঁশ, কাঠ কিংবা লোহার খুঁটি দিয়ে তৈরি হয় ঘরের কাঠামো। তারপর এই কাঠামোতে টিনের বেড়া দেওয়া হয়, উপরে বসে টিনের চাল। মোটকথা, ব্যবহার করার মতো একটি ঘর তৈরির জন্য একটি কাঠামো লাগবেই। স্কুলঘরটি তৈরি হবার পর এখানে আসেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ কাজ করার মাধ্যমে স্কুলটিকে সচল রাখেন।

এই যে উদাহরণটি দেখলে, এর সঙ্গে ভীষণ মিল পাবে আমাদের শরীরের। উদাহরণের স্কুলঘরের মতো আমাদের শরীরেরও একটি কাঠামো আছে। মানব শরীরের কাঠামোকে বলা হয় কঙ্কাল (Skeleton)। এই কঙ্কালের ওপর আছে শরীরের মাংসপেশি (Muscle), চামড়া (Skin) ইত্যাদি। শরীরের ভেতরে আছে

ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, কলিজা ইত্যাদি অঙ্গ। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সেগুলোর কাজ ঠিকঠাক করে চলছে—এক অঙ্গ আরেক অঙ্গের কাজে সহযোগিতা করছে। এভাবে সেগুলো আমাদের শরীরটাকে সচল রাখছে।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে একাদশ অধ্যায়ে আমাদের মানব শরীরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া আছে, তোমার চাইলে চট করে ছোট ভাইবোনদের কাছ থেকে বইটা নিয়ে এই অধ্যায়টা একবার দেখেও নিতে পারো। সেখানে শরীরের কোষ থেকে শুরু করে কীভাবে বিভিন্ন অঙ্গ এবং তন্ত্র গঠিত হয় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। অনেকগুলো অঙ্গ মিলে যখন একই কাজে নিযুক্ত হয়, তখন সেগুলোকে তন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তাহলে উপরের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, আমাদের শরীরের যে কঙ্কাল ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলো আছে, সেগুলো মিলে আসলে একটি তন্ত্র তৈরি করে। কারণ, সেগুলো সমবেতভাবে আমাদের মানব শরীরের একটি কাঠামো প্রদান করার মতো কাজটি সম্পন্ন করছে। আমাদের মাংসপেশি সরাসরি কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমরা যে হাঁটাচলা করি, খাই, বই পড়ি এসব কাজেই কঙ্কালের সঙ্গে মাংসপেশিগুলোও যোগ দেয়। এ কারণে কঙ্কাল ও মাংসপেশিকে একসঙ্গে মিলিয়ে পেশি-কঙ্কালতন্ত্র হিসেবে আলোচনা করা যায়।

আমাদের শরীর গঠনের কাঠামো হিসেবে কাজ করে আমাদের কঙ্কালতন্ত্র।

শুধু শরীরের তো কাঠামো থাকলেই হবে না। এর বৃদ্ধির দরকার হবে, একে বাঁচিয়েও রাখতে হবে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য যত রকম কাজ করি, সব কিছুর জন্য শক্তির দরকার হয়। এই শক্তি আসে আমাদের খাবার থেকে। আমরা যেসব খাবার খাই, সেগুলোকে ভেঙে পুষ্টি উপাদান বের করে আমাদের কোষের ভেতরে পৌঁছানোর উপযোগী করে আমাদের শরীরের আরেকটি তন্ত্র। একে বলা হয় পৌস্টিকতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র।

এই অধ্যায়ে আমরা কঙ্কালতন্ত্র এবং পৌস্টিকতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব। কিছু নতুন নাম, শব্দ হয়তো আলোচনায় আসবে। কিন্তু সবার আগে খেয়াল করবে সেগুলো কী কাজ করছে, কীভাবে কাজ করছে। তাহলে নতুন নাম বা শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে কোনো সমস্যা হবে না।

কঙ্কালতন্ত্র

আমাদের শরীরকে একটি কাঠামো প্রদান করে শরীরের শক্ত ও কোমল হাড়গুলো। তোমরা অনেকেই হয়তো জানবে 'হাড়' শব্দটির আরেকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'অস্থি'। কঙ্কালতন্ত্রের আলোচনায় আমরা অস্থি শব্দটিই ব্যবহার করব।

অস্থি (হাড়) ও তরুণাস্থি (কোমল হাড়) দ্বারা গঠিত যে তন্ত্র দেহের মূল কাঠামো গঠন করে এবং অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ ও কোমল অঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্র বহিঃকঙ্কাল ও অন্তঃকঙ্কাল নিয়ে গঠিত। নাম শুনেই বুঝতে পারছ, অন্তঃকঙ্কাল আমাদের

শরীরের ভেতরে থাকে। তাই একে বাইরে থেকে দেখা যায় না। অপরদিকে, বহিঃকঙ্কাল বলতে শরীরের দৃশ্যমান শক্ত অঙ্গগুলো যেমন নখ, দাঁত, লোম, চুল প্রভৃতিকে বুঝায়।

অস্থি বা হাড়

তুমি তোমার নিজের হাত-পায়ে একটু জোরে চাপ দিলেই চামড়ার নিচে শক্ত অস্থি বা হাড়ের উপস্থিতি টের পাবে। অস্থিকে সাধারণভাবে শরীরের কঠিন ও প্রাণহীন অংশ মনে হতে পারে। আসলে তা নয়, অস্থি হলো এক ধরনের জীবন্ত টিস্যু। এ টিস্যু শক্ত ও স্পঞ্জ-জাতীয় উভয় পদার্থে গঠিত। অস্থির বাইরের অংশটি শক্ত, কিন্তু ভিতরের অংশে স্পঞ্জ-জাতীয় পদার্থ থাকে, যাকে অস্থিমজ্জা বলা হয়। অস্থিমজ্জার শতকরা ৪০ ভাগ জৈব পদার্থ ও বাকি ৬০ ভাগ অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশ ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় অস্থিতে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ পানি থাকে। অন্যান্য অঙ্গের মতো প্রতিটি অস্থিতে রক্ত ও স্নায়ুর সরবরাহ থাকে। খেয়াল করো যে স্নায়ুর মাধ্যমে আমরা এবং সকল প্রাণী যেকোনো উদ্দীপনা বা উত্তেজনা গ্রহণ করা এবং তাতে সাড়া দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং শরীরের অন্য অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারি।

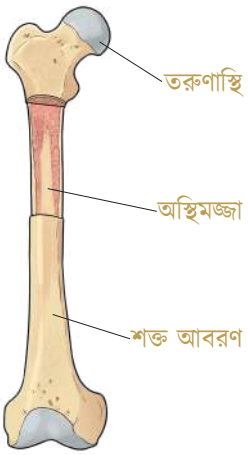

অস্থির বিভিন্ন অংশসমূহ

তরুণাস্থি: অস্থির তুলনায় তুলনামূলকভাবে নমনীয় এবং সজীব হচ্ছে তরুণাস্থি। সাধারণত অস্থির প্রান্তভাগে নীলাভ আবরণের মতো তরুণাস্থি অবস্থান করে। তরুণাস্থি অস্থি নড়াচড়াকে সহজ করে এবং দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলে থাকে, যাকে অস্থিসন্ধি বলা হয়। তরুণাস্থির উপরিভাগ সাধারণত মসৃণ থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, নতুন যে শিশু জন্ম নেয়, তার শরীর অনেক নমনীয় থাকে। এর কারণ তার শরীর মূলত তরুণাস্থি দিয়ে গঠিত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব তরুণাস্থি ধীরে ধীরে শক্ত অস্থিতে পরিণত হয়।

দুটো হাড়ের সংযোগস্থলে নমনীয় তরুণাস্থি।

অস্থি আবরণী: অস্থির বাইরে যে মজবুত ও পাতলা আবরণ শক্তভাবে আটকে থাকে, তাকে বহিরাবরণ (Periosteum) বলে। বহিরাবরণের ভিতর দিয়ে রক্তনালি ও স্নায়ু যাতায়াত করতে পারে। তাছাড়া অস্থির নড়াচড়া বা সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় মাংসপেশি ও পেশিবন্ধনী এর উপর এসে আটকায়। এখানে তোমাদের সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি যে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটানোর জন্য শরীরের মাংসপেশি কাজ করে। আর পেশিবন্ধনী বা টেন্ডন (Tendon) হলো একটি সংযোগকারী টিস্যু যা হাড়ের সঙ্গে পেশিকে সংযুক্ত করে। এসব বিষয়ে উপরের শ্রেণিতে আরো জানতে পারবে।

অস্থিসন্ধি

মানবদেহের অস্থিগুলো বিভিন্নভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অন্তঃকঙ্কাল তৈরি করেছে। দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে। প্রতিটি সন্ধির অস্থিপ্রান্তগুলো এক রকম নমনীয় রজ্জুর মতো বন্ধনী দিয়ে শক্তভাবে আটকানো থাকে, ফলে অস্থিগুলো সহজে সন্ধিস্থল থেকে সরে যেতে পারে না।

কোনো কোনো অস্থিসন্ধি একেবারে অনড়, যেমন মাথার খুলির অস্থিসন্ধি ও কোমরের দিকের শ্রেণিচক্রের সন্ধি। কিছু অস্থিসন্ধি আবার সামান্য নড়াচড়া করতে পারে, ফলে আমরা দেহকে সামনে, পিছনে ও পাশে বাঁকাতে পারি, যেমন- মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি। এগুলো ছাড়া দেহে প্রায় ৭০টিরও বেশি সহজে নড়াচড়া করা যায় এ রকম অস্থিসন্ধি রয়েছে। এদেরকে সাইনোভিয়াল সন্ধি বলে। সাইনোভিয়াল সন্ধিস্থলে একটি অস্থির একদিকের বলের মতো গোল অংশটি অন্য অস্থির কোটরে এমনভাবে স্থাপিত হয় যে, অস্থির সকল দিকে চলাচল সম্ভব হয়। এ ধরনের সন্ধিতে সাইনোভিয়াল (Synovial) রস নামক এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় অস্থি দুটি সহজে নড়াচড়া করতে পারে। হাতের কনুই, হাঁটু ও কাঁধের সন্ধি সাইনোভিয়াল সন্ধির অন্তর্ভুক্ত।

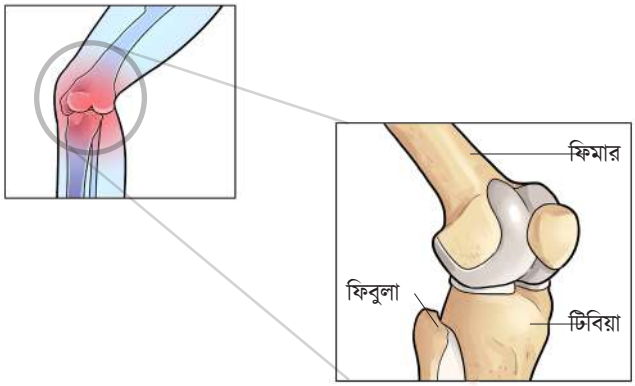

আমাদের হাঁটুর সন্ধি সাইনোভিয়াল সন্ধির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ

- কঙ্কাল দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সহায়তা করে এবং দেহের মজবুত কাঠামো গঠন করে।
- অস্থিসন্ধি গঠনের মাধ্যমে এটি চলাচলে সাহায্য করে।
- কঙ্কাল দেহকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সহায়তা করে।
- ভ্রূণ অবস্থা থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত কঙ্কালের মজ্জা বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা তৈরি করে। এ কারণে অস্থিসমূহকে রক্ত উৎপাদনের কারখানা বলা হয়।
- দেহের অভ্যন্তরীণ সকল চাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- আমাদের দেহের অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং নরম অঙ্গসমূহ যেমন মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদিকে বাইরের যেকোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে প্রাথমিক সুরক্ষা দেয় আমাদের কঙ্কালতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ।

পরিপাকতন্ত্র

প্রতিদিন আমরা জীবনের যতগুলো কাজ করি, তার মধ্যে একটি খুবই সাধারণ কাজ হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ। কখনো কি ভেবে দেখেছ আমরা যে বিচিত্র রকম খাবার খাই সেগুলো কীভাবে আমাদের শরীর ব্যবহার করে? আমাদের শরীরের সকল কাজ হয় যে কোষগুলোর মাধ্যমে সেগুলো কোনোটিই কিন্তু আমাদের গ্রহণ করা খাবারগুলো সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। বরং সকল খাবারকেই সেটি ভেঙে এমন কিছু উপাদান বের করে নেয়, যা শরীরের শক্তি ও পুষ্টি উপাদান প্রদান করে। এর মাধ্যমেই শরীরের টিকে থাকা এবং ক্ষয় পূরণের কাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় শরীরের যা প্রয়োজন তা-ই শরীর গ্রহণ করে বাকিটা বর্জ্য বা অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এ কাজ করার জন্য যে তন্ত্র কাজ করে সেটির নাম পরিপাকতন্ত্র। সব জীবের বেঁচে থাকার জন্য শক্তি প্রয়োজন, খাদ্য পরিপাক করার মাধ্যমেই এই শক্তি আসে।

আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাদ্য গিলে ফেলার পর আমরা খাদ্যকে আর দেখতে পাই না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই খাদ্য পরিপাক হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, যা দেহ শোষণ করে নেয়। হজম না হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো দেহ মল বা বর্জ্য রূপে বের করে দেয়। খাদ্য গ্রহণ এবং মল নিষ্কাশণ—এই দুটি ঘটনার মাঝখানে দেহের ভিতর খাদ্যের যে পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর আমাদের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা শরীরের ভেতরের এই কাজগুলো বাইরে থেকে দেখতেও পাই না। সুস্থ দেহে এ কাজটি আপনা-আপনি ঘটে।

পরিপাকতন্ত্র আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত একটি তন্ত্র। এই তন্ত্র শুরু হয় আমাদের মুখগহ্বর থেকে। এই মুখগহ্বরের শেষ প্রান্ত থেকে ফাঁপা নলের মতো অংশটিকে খাদ্যনালি (বা অন্ননালি) বলে। এই নলটি আমাদের পেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ হয় পায়ুপথে (anus), যার মধ্য দিয়ে বর্জ্য হিসেবে শরীর থেকে মল বের হয়ে যায়। মুখ থেকে শুরু করে খাদ্যনালির এই শেষ অংশের মধ্যে অবস্থিত নলের বিভিন্ন অংশকে নানান নামে ভাগ করা হয়। এ ছাড়া এই খাদ্যনালির সঙ্গে আরো কিছু অঙ্গ জড়িত যেগুলো খাদ্য পরিপাকে সহযোগিতা করে। পরিপাকতন্ত্র বলতে খাদ্যনালি এবং এর সঙ্গে যুক্ত এসব অঙ্গকে বুঝানো হয়।

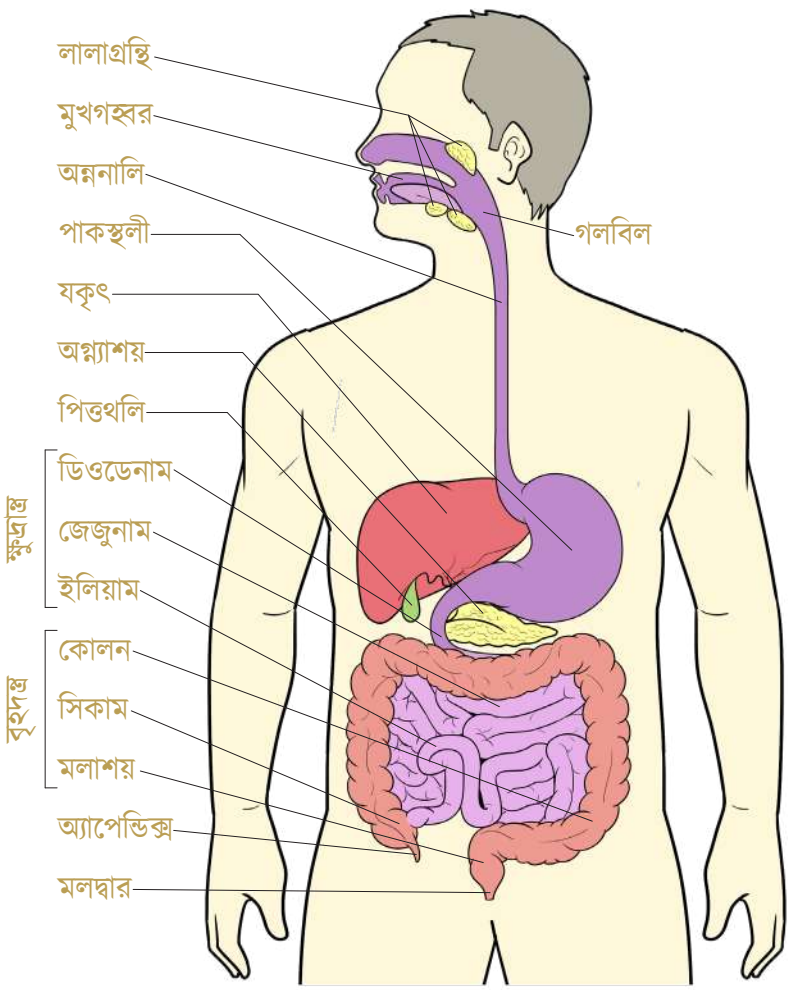

পরিপাকতন্ত্রের অংশসমূহ

আমরা এবার পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গসমূহের নাম এবং কাজ সম্বন্ধে জানব।

১. মুখছিদ্র: আমাদের উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁটের মাঝখানের ফাঁকা অংশটুকুই মুখছিদ্র। প্রচলিত অর্থে আমরা একে কেবল 'মুখ' হিসেবেই আখ্যায়িত করি। আমাদের ঠোঁটদুটো খুলে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। মুখছিদ্র পথেই আমাদের গ্রহণ করা খাবার খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে।

২. মুখগহ্বর: মুখছিদ্রের পরেই মুখগহ্বরের অবস্থান। সামনে দাঁতসহ দুটি চোয়াল দ্বারা মুখগহ্বর বেষ্টিত। পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। নিচের চোয়ালে ১৬টি আর উপরের চোয়ালে ১৬টি থাকে।

মুখগহ্বরের উপরে রয়েছে তালু এবং নিচের দিকে রয়েছে মাংসল জিহ্বা। চোয়ালের ভেতরের রয়েছে তিনটি গ্রন্থি,

যেগুলোকে লালাগ্রন্থি বলে আমরা চিনি, সেখান থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য গ্রহণ, গলাধঃকরণ ও পরিপাকে সাহায্য করে। দাঁত আমাদের বড় বড় খাদ্যবস্তুকে কেটে ছোট ছোট করে ফেলে এবং পিষে নরম করতে সাহায্য করে। এসময় জিহ্বা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যবস্তুকে বার বার দাঁতের নিচে পাঠিয়ে চিবাতে সাহায্য করে। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং খাদ্যবস্তুকে গিলতে সাহায্য করে। লালা রসে এক ধরনের এমাইলেজ নামক উৎসেচক বা এনজাইম রয়েছে, যা শর্করাজাতীয় খাবারকে আংশিক ভেঙে ফেলে। পরবর্তী সময়ে পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গগুলো আংশিক ভাঙা শর্করাকে সম্পূর্ণ ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. গলবিল: মুখগহ্বরের পরেই এর অবস্থান। এর মাধ্যমেই খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর থেকে অন্ননালি বা গ্রাসনালিতে যায়। গলবিলে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। তাই এখানে কোনো খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না।

৪. অন্ননালি: গলবিল ও পাকস্থলীর মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। খাদ্যবস্তু এর ভিতর দিয়ে গলবিল থেকে পাকস্থলীতে যায়।

৫. পাকস্থলী: অন্ননালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। গলবিল ও অন্ননালির ক্রমাগত সংকোচনের ফলে পিচ্ছিল খাদ্যবস্তু এখানে এসে জমা হয়। পাকস্থলীর আকৃতি থলির মতো। এর প্রাচীর বেশ পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric glands) নামে প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এখানে খাদ্য সাময়িক জমা থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এক ধরনের রস যাতে নানান রকম উৎসেচক থাকে। পাচক রস নামে পরিচিত এই রস শর্করা, আমিষ এবং চর্বিজাতীয় খাবার পরিপাক করতে সাহায্য করে।

৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine): ক্ষুদ্রান্ত্র হলো পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ। এটা পরিপাকনালির সবচেয়ে দীর্ঘ অংশও বটে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা: (ক) ডিওডেনাম, (খ) জেজুনাম ও (গ) ইলিয়াম।

(ক) ডিওডেনাম: এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ। পাকস্থলীর পরেই এর অবস্থান এবং দেখতে 'ট' আকৃতির। পিত্তথলি থেকে পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্নাশয় রস নালির মাধ্যমে এখানে এসে খাদ্যের সঙ্গে মিশে। এ রসগুলোও পরিপাকে অংশ নেয়। এখানে আমিষ, শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য উপাদানের পরিপাক ঘটে।

(খ) জেজুনাম: এটা ডিওডেনাম এবং ইলিয়ামের মধ্যের অংশ। এটি ক্ষুদ্রান্তের সবচেয়ে বিস্তৃত অংশ যেখানে খাবারের পরিপাক প্রক্রিয়া অব্যহত থাক।

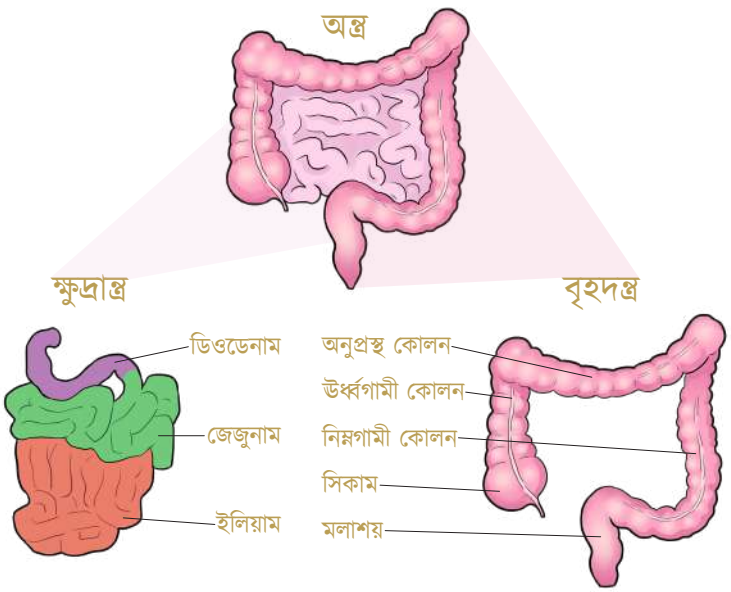

অন্ত্রের বিভিন্ন অংশসমূহ

(গ) ইলিয়াম: এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ। ইলিয়ামের ভিতরের প্রাচীরে শোষণ যন্ত্র থাকে। ব্যাপন পদ্ধতিতে প্রাচীরের গায়ে আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ (যা শোষণের ব্যাপ্তি বাড়াতে সাহায্য করে) থাকে। এদের একত্রে ভিলাই (Villi) বলে। হজমের পর খাদ্যের সারাংশ ভিলাই দ্বারা শোষিত হয়।

৭. বৃহদন্ত্র (Large intestine): ক্ষুদ্রান্ত্রের পরেই বৃহদন্ত্রের শুরু। এটা ইলিয়ামের পর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। নামে বৃহদন্ত্র হলেও লম্বায় এটা ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ছোট। কিন্তু ভিতরের ব্যাস ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের ব্যাস থেকে বড় থাকে। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যেগুলো হচ্ছে, (ক) সিকাম (খ) কোলন এবং (গ) মলাশয়। মলাশয় হচ্ছে বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্ত। দেখতে একটুখানি থলির মতো। খাদ্যের অপাচ্য বা অহজমকৃত অংশ এখানে মলরূপে জমা হয়।

বৃহদন্ত্রে খাদ্য হজম হয় না। এখানে কোনো পাচক রস বা এনজাইম তৈরি হয় না। বৃহদন্ত্র মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে। এ কাজটি অত্যন্ত দরকারি। এর ফলে শরীর থেকে পানি বেশি পরিমাণে বের হওয়া রোধ হয়।

৮. মলদ্বার বা পায়ু: এটি পরিপাকনালির শেষ প্রান্ত। এই প্রান্ত পথেই পরিপাক নালি দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। বৃহদন্ত্রের সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ মলাশয়ে খাদ্যের যে অপাচ্য অংশ মল হিসেবে সঞ্চিত হয়, তা প্রয়োজন মতো এই পায়ু দিয়ে শরীরের বাইরে বর্জিত হয়।

পরিপাকগ্রন্থি ও সেগুলোর কাজ

পরিপাকনালির সঙ্গে যুক্ত যেসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে, সেগুলোকে পরিপাকগ্রন্থি বলে। লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পরিপাকগ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত।

লালাগ্রন্থি: এ গ্রন্থি থেকে লালা ক্ষরণ হয়। লালায় এনজাইম ও পানি থাকে। পানি খাদ্যকে নরম করে। লালার এনজাইম হলো অ্যামাইলেজ।

যকৃৎ: দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃৎ। যকৃৎ থেকে পিত্তরস তৈরি হয়। পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে। হজমের সময় পিত্তনালি দিয়ে পিত্তরস ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

অগ্ন্যাশয়: প্রধানত তিন রকমের এনজাইম অগ্ন্যাশয়ে তৈরি হয়—অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ এবং লাইপেজ। এগুলো ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন নামক দুটি প্রোটিয়েজ এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্য, লাইপেজ চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং অ্যামাইলেজ শর্করাজাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি: গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীরে থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস।

আন্ত্রিক গ্রন্থি: ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের ভিলাসে প্রচুর আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিক রস (Intestinal juice)।

খাদ্য পরিপাকসংক্রান্ত কিছু সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার

আমাদের পুরো শরীরের সুস্থতার একটি বিরাট নির্ভরতা আছে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতার ওপর। সঠিক স্বাস্থ্যবিধি না মানলে, জীবন-যাপন সঠিকভাবে না করলে আমাদের পরিপাকতন্ত্রে বেশ কিছু সাধারণ অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

১. গ্যাস্ট্রাইটিস: সাধারণত বেশি মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খেলে, খাওয়ায় অনিয়ম করলে বুক জ্বালা করে এবং অম্ল রোগ হয়। এতে পেটে বাড়তি অম্ল বা অ্যাসিড তৈরি হয় আর তা থেকে পেট বা বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তি বা জ্বালার ভাব হয়। ফলস্বরূপ গলা ও পেট জ্বালা করে এবং পেটে ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মতো এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে।

নিয়মিতভাবে কম মসলা ও কম তেলযুক্ত খাবার খাওয়া এবং সময়মতো খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করলে এ রোগ প্রতিরারোধ করা যায়।

২. আমাশয় : আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। মূলত জীবাণুর সংক্রমণে আমাশয় হয়। দুই ধরনের আমাশয় দেখা যায়। যথা: (ক) অ্যামিবিক আমাশয় এবং ব্যাসিলারি আমাশয়।

(ক) অ্যামিবিক আমাশয়: প্রধানত এন্টামিবা (Entamoeba) নামের এক প্রকার এক কোষী প্রাণী মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। এ রোগের উপসর্গগুলো হলো, তলপেটে ব্যথা, মলের সঙ্গে রক্ত বা শ্লেষ্মা বের হওয়া।

নলকূপের পানি বা ফুটানো পানি পান; পানি ও শাকসবজি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা; মাছি, তেলাপোকা বা আরশোলা থেকে খাদ্যবস্তুকে রক্ষার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

(খ) ব্যাসিলারি আমাশয়: শিগেলা (Shigella) নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রকে আক্রমণ করলে এ ধরনের আমাশয় হয়। এই জীবাণু বৃহদন্ত্রের ঝিল্লিকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সঙ্গে পিচ্ছিল শ্লেষা বের হয়। অনেক সময় পায়খানার সঙ্গে রক্ত যায়। এ জন্য এ রোগকে রক্ত আমাশয় বলে। এ রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩. কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation): এটি একটি অস্বাভাবিক শারীরিক অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি সহজে মলত্যাগ করতে সক্ষম হন না। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে সাধারণত এক-দুই দিন পরপর মলত্যাগের বেগ হওয়া এবং শুষ্ক ও কঠিন মল নিষ্কাশিত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নয়। তবে কখনো কখনো তা অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। যেমন- পৌষ্টিকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন ধীর হওয়া, কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি না খাওয়া, মলত্যাগের বেগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগ না করা ইত্যাদি। দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে পায়ুপথ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা প্রচণ্ড ব্যথার উদ্রেক করতে পারে। বেশির ভাগ মানুষই তাদের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারে।

নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করলে, নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করলে, নিয়মিত শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার খেলে এ অসুবিধা অনেকাংশে দূর করা যায়। বেশি দিন ধরে এই সমস্যা থাকলে ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

পরিপাকতন্ত্রের যত্ন

আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব শক্তি আমরা পাই খাদ্য পরিপাক করার মাধ্যমে। এ কারণে আমাদের সুস্থ পরিপাকতন্ত্র আমাদের সুস্থ জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সাধারণ নিয়ম-কানুন মেনে আমরা আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে ভালো রাখতে পারি।

পরিপাকতন্ত্রের যত্ন শুরু হয় আমাদের মুখ থেকে। প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা ও পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে থাকলে তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের ক্ষয় হয়। খুব বেশি মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়া উচিত নয়। মিষ্টি দাঁতের ক্ষয়ের জন্য দায়ী।

আমরা যেসব খাবার খাব তা পরিষ্কার ও সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। বাসি বা পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়। আঙুলের নখ ছোট রাখা এবং খাওয়ার আগে থালাবাটি ও হাত অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে। খাবার নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া উচিত। একসঙ্গে বেশি খাবার খাওয়া যাবে না। সব সময় সুষম খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে। সব সময় পানি ফুটিয়ে খেতে হবে কিংবা নিরাপদ ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে। খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে। অধিক মসলা ও তেলযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে। ফাস্টফুড-জাতীয় খাবার আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের খাবারের প্রতি কোনোভাবেই আসক্ত হওয়া যাবে না।

অনুশীলনী ?

১। তোমাদের বইয়ে উল্লেখ করা খাদ্য পরিপাক সংক্রান্ত অসুখগুলো ছাড়া তোমার জানা আরও কয়েকটি অসুখের নাম উল্লেখ করতে পারবে?

২। আমাদের কোন কোন অস্থি-সন্ধি সকল দিকে নাড়াচাড়া করতে পারে?

অধ্যায় ১৪

বিভিন্ন ধরনের শিলা

অধ্যায় ১৪ বিভিন্ন ধরনের শিলা

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ পাললিক, আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা: গঠন এবং ব্যবহার
- ☑ ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে শিলার ধরন শনাক্তকরণ
- ☑ শিলার বিভিন্ন উপাদান
- ☑ শিলা ও খনিজ পদার্থ সৃষ্টিতে বল এবং শক্তির ভূমিকা
- ☑ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও আকরিক

আমরা জানি পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের বা উপরের পৃষ্ঠ ভূত্বক নামে পরিচিত। এই ভূত্বক নানা প্রকার শিলা (Rock) দ্বারা গঠিত। ভূত্বকে যেসব শিলা পাওয়া যায় সেগুলোকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে, (১) আগ্নেয় শিলা (২) পাললিক শিলা এবং (৩) রূপান্তরিত শিলা। উল্লিখিত তিন প্রকার শিলার মধ্যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় আগ্নেয় শিলা। এ ছাড়া স্বল্প পরিমাণে পাললিক এবং রূপান্তরিত শিলাও বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যেতে পারে।

পাললিক, আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা: গঠন এবং ব্যবহার

আগ্নেয় শিলা: আগ্নেয় শিলা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত লাভা কিংবা ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ গলিত ম্যাগমা ঠান্ডা এবং শক্ত হয়ে তৈরি হয়। এগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠে বা পৃথিবীপৃষ্ঠের নিচে গঠিত হতে পারে। পৃথিবীপৃষ্ঠে তৈরি হলে তাকে বলে বহিরাগত শিলা এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের নিচে গঠিত হলে তাকে বলে অনুপ্রবেশকারী শিলা। এই দুই ধরনের শিলার মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, বহিরাগত শিলায় লাভা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যায়। লাভা দ্রুত ঠান্ডা হবার কারণে এই ধরনের শিলায় বড় স্ফটিক বা ক্রিস্টাল দেখা যায় না। গ্রানাইট এ রকম শিলার উদাহরণ। অন্যদিকে ভূত্বকের নিচে ম্যাগমা ধীরে ধীরে ঠান্ডা এবং কঠিন হলে অনুপ্রবেশকারী শিলা গঠিত হয়। ধীরে ধীরে শীতল হয় বলে এই ধরনের শিলায় নানা ধরনের খনিজ পদার্থের স্ফটিক বা ক্রিস্টাল তৈরি হয়। পৃথিবীর কিছু কিছু স্থানে নানান ধরনের মূল্যবান রত্ন-পাথর এই প্রকার শিলায় পাওয়া যায়।

ভূত্বক গঠনের প্রধান উপাদান এই আগ্নেয় শিলা (প্রায় ৯০% থেকে ৯৫%)। অধিকাংশ স্থানে আগ্নেয় শিলার উপরে পলল কিংবা পাললিক শিলার স্তর থাকার কারণে তা দেখা যায় না। তবে আগ্নেয়গিরিপ্রবণ এলাকাতে ভূপৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নানান ধরনের আগ্নেয় শিলা দেখতে পাওয়া যায়।

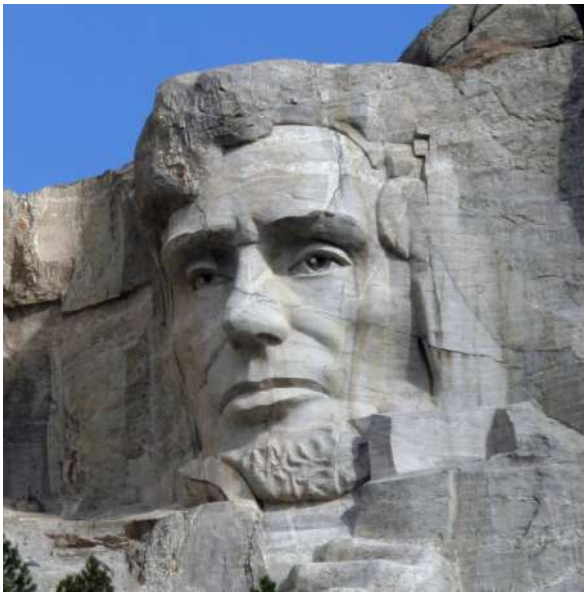

যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট রাশমোরে গ্রানাইট পাথরে তৈরি আব্রাহাম লিংকনের বিশাল ভাস্কর্য

আগ্নেয় শিলা প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নানান কাজে ব্যবহার করে আসছে। গ্রানাইট সাধারণত বড় ভবন এবং ভাস্কর্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গ্রানাইটের টাইলস অনেক শক্ত ও মজবুত হয় থাকে। পিউমিস নামক বহিরাগত আগ্নেয় শিলা তৈরি হওয়ার সময় তার ভেতরে গ্যাস আবদ্ধ থাকার কারণে এটি এত হালকা যে তা পানিতে ভাসে। জিন্সের কাপড়ে যে হালকা দাগ থাকে, সেটি পিউমিস ঘষে তৈরি করা হয়। দাঁত সহজে পরিষ্কার করার জন্য টুথপেস্টে পিউমিসের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়।

পাললিক শিলা: তোমরা নিশ্চয় বর্ষাকালে নদীতে ঘোলা পানি বয়ে যেতে দেখেছ। পানিতে মাটির বিভিন্ন আকারের দানা মিশে থাকার কারণে তা ঘোলা দেখায়। এই পানি একটি পরিষ্কার বোতলে ভরে একটুও না ঝাঁকিয়ে কোথাও দুই দিন রাখলেই দেখবে বোতলের পানি দেখতে পরিষ্কার লাগছে এবং বোতলের তলায় মাটির পাতলা স্তর পড়েছে। এই তলানিটাকে বলা হয় পলল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমা পলল জমাট বেঁধে যে শিলায় পরিণত হয় তাকে বলা হয় পাললিক শিলা। এই সকল পললের মধ্যে রয়েছে নুড়ি পাথর, বালু, কর্দম, মৃত জীবের দেহাবশেষ ইত্যাদি। এ ছাড়া পানি শুকিয়ে গেলে তাতে দ্রবীভূত বিভিন্ন রাসায়নিক মিলেও পাললিক শিলা গঠন করে।

অধিকাংশ পলল নদীর পানির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। প্রবহমান পানিতে থাকা এই পলল নদীর পাড় বরাবর এবং নদীর শেষ হয় যেখানে সেই স্থানে জমতে থাকে। যখন এই স্তরগুলো শক্ত হয়ে যায়, তখন তা সেই পললের স্তরকে সংরক্ষিত করে ফেলে এবং পাললিক শিলায় পরিণত হয়। সেই পাললিক শিলার উপর আরো পললের স্তর পড়তে থাকে যা পরবর্তী সময়ে নতুন পাললিক শিলায় পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে নতুন স্তর থাকে সবচেয়ে উপরে এবং পুরনো পলল অথবা পাললিক শিলার স্তর ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে পাওয়া যায়। পাললিক শিলাতে ফসিল পাওয়া যায় এবং

পাললিক শিলার স্তর

পাললিক শিলায় ফসিল বা জীবাশ্ম

কোন স্তরে কোন ফসিল পাওয়া গেছে সেটা দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, একটি প্রাণী কত আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত এবং কীভাবে সেটি বিবর্তিত হয়েছে।

যেমন টাইরেনেসরাস রেক্সের ফসিল এবং পিসানোসরাসের ফসিল পাললিক শিলার দুটি ভিন্ন স্তরে পাওয়া গেছে এবং তা থেকে আমরা জানতে পারি পিসানোসরাস টাইরেনেসরাস রেক্সের অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছিল। তোমরা যদি কখনও পাললিক শিলা আছে এমন এলাকায় যাও তবে দেখতে পাবে তা স্তরে স্তরে গঠিত হয়েছে।

পাললিক শিলা যান্ত্রিক, রাসায়নিক এবং জৈব উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে। কয়লা, চুনাপাথর ইত্যাদি হচ্ছে জৈব উপায়ে সৃষ্টি হওয়া পাললিক শিলার উদাহরণ।

পাললিক শিলা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই শিলাতে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানি পাওয়া যায়। এ ছাড়া চুনাপাথর কাঁচামাল হিসেবে সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহৃত হয়। খনিজ তেল এই ধরনের শিলাতে পাওয়া যায় বলে সেগুলোকে শিলা-তেল বা পেট্রোলিয়াম বলে।

রূপান্তরিত শিলা: শিলার রূপান্তরের ক্ষেত্রে যেকোনো শিলার উপর প্রযুক্ত তাপ এবং চাপ প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তাপ ও চাপের ফলে শিলার পরিবর্তনকে রূপান্তর প্রক্রিয়া বলা হয়। এ ক্ষেত্রে শিলার গঠনগত অথবা রাসায়নিক অথবা উভয় প্রকার পরিবর্তন হয়ে থাকে। আগ্নেয় বা পাললিক শিলা রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলা গঠিত হয়। রূপান্তরিত শিলা আবার রূপান্তরিত হয়ে নতুন রূপান্তরিত শিলা তৈরি হতে পারে।

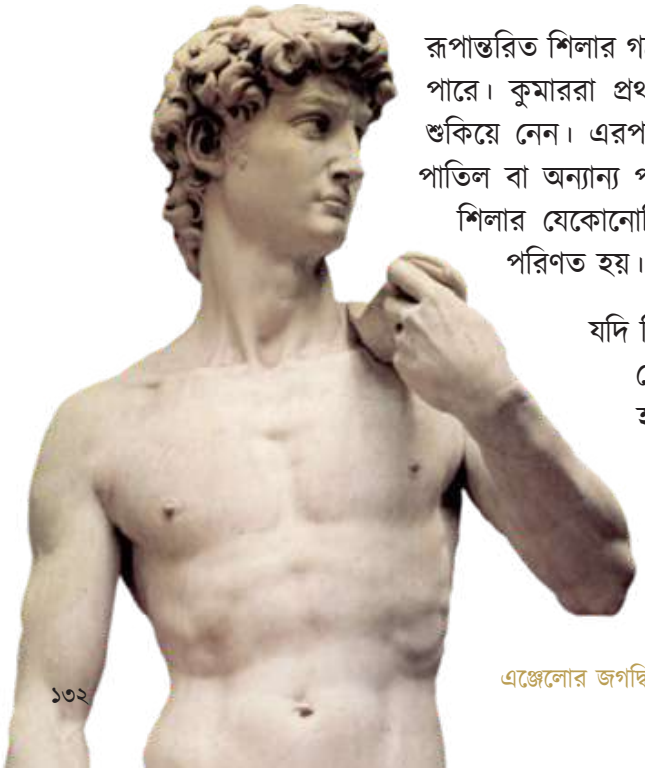

রূপান্তরিত শিলা মার্বেল পাথরে তৈরি করা মাইকেল এঞ্জেলোর জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর্য 'ডেভিড'।

রূপান্তরিত শিলার গঠন প্রক্রিয়াকে মাটির পাত্রের গঠনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কুমাররা প্রথমে কাদামাটি থেকে পাতিলের আকার তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নেন। এরপর তা আগুনে ২-৩ দিন পোড়ানো হয়। ফলে শক্ত মাটির পাতিল বা অন্যান্য পাত্র তৈরি হয়। প্রাকৃতিকভাবে সেভাবে প্রধান তিন প্রকার শিলার যেকোনোটি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে তা সম্পূর্ণ নতুন শিলায় পরিণত হয়।

যদি শিলার উপর তাপ কিংবা তাপ এবং চাপ একত্রে প্রযুক্ত হয়, সে ক্ষেত্রে পূর্বের শিলার ক্রিস্টাল/কেলাসের গঠন পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন এবং পূর্বের শিলার তুলনায় দৃঢ় কেলাসের গঠনসমৃদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন একটি রূপান্তরিত শিলা গঠন করে। আবার কোনো শিলার এক পাশ থেকে প্রচণ্ড চাপ প্রযুক্ত হলে তার কেলাসসমূহ পুনঃসজ্জিত হয়ে ব্যান্ডের মতো ফোলিয়েশন নামক স্তর সৃষ্টি করে।

কোয়ার্টজাইট এবং মার্বেল সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত রূপান্তরিত শিলা। এগুলো নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ভবনে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে এবং শিল্পকলায় ব্যবহৃত হয়। মার্বেল দিয়ে টাইলস, বিভিন্ন পাত্র এবং ভাস্কর্য তৈরি করা হয়। মার্বেলের গুঁড়া টুথপেস্ট, প্লাস্টিক এবং কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কোয়ার্টজাইট খুবই শক্ত শিলা এবং রেলপথ নির্মাণে রেললাইনের নিচে ব্যবহার করা হয়।

রূপান্তরিত শিলায় ফলিয়েশন

ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে শিলার ধরন শনাক্তকরণ

বিভিন্ন ধরনের শিলা শনাক্তকরণের নানা ধরনের পদ্ধতি রয়েছে।

আগ্নেয় শিলা: অভ্যন্তরস্থ আগ্নেয় শিলা সাধারণত অত্যন্ত শক্ত এবং বিভিন্ন খনিজের কেলাস দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। আবার বহিঃস্থ আগ্নেয় শিলাতে কেলাসের আকার অতিক্ষুদ্র এমনকি কেলাস অনুপস্থিত থাকতে পারে।

পাললিক শিলা: পাললিক শিলার ক্ষেত্রে সাধারণত স্তর লক্ষ করা যায়। এই ধরনের শিলায় ফসিল বা জীবাশ্ম উপস্থিত থাকতে পারে।

রূপান্তরিত শিলা: রূপান্তরিত শিলার ক্ষেত্রে ফলিয়েশন বা ব্যান্ড দেখা যায়।

শিলার বিভিন্ন উপাদান

শিলার গাঠনিক উপাদানকে মিনারেল বা খনিজ বলা হয়। খনিজ হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অজৈব, কঠিন এবং এক বা একাধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত বস্তু। খনিজের নির্দিষ্ট কেলাসের গঠন থাকে। শিলার সঙ্গে খনিজের মূল পার্থক্য হলো এক বা একাধিক খনিজ মিলে একটি শিলা গঠিত হয় এবং খনিজের নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন রয়েছে যা সাধারণত শিলায় নেই। ভূত্বকে চার হাজারেরও বেশি প্রকারের খনিজ পাওয়া যায় তবে ভূত্বকের শতকরা ৯০ (নব্বই) ভাগেরও বেশি সিলিকেট খনিজ দ্বারা তৈরি, যার মূল উপাদান হচ্ছে সিলিকন (২৭%) ও অক্সিজেন (৪৬%)। এই কারণেই ভূত্বকে অক্সিজেন ও সিলিকন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন খনিজ তাদের ভৌত বৈশিষ্ট্য যেমন রং, ঔজ্জ্বল্য, দৃঢ়তা, আপেক্ষিক গুরুত্ব, স্বাদ, ঘ্রাণ, চুম্বকত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে একটি অপরটির থেকে পৃথকভাবে চেনা যায়। আবার বিভিন্ন রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য যেমন, অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদিও খনিজ শনাক্তকরণে ভূমিকা রাখে। আমরা আমাদের আশপাশে নির্মাণকাজে যে বালু বা পাথর ব্যবহার হতে দেখি, তাতে মূলত কোয়ার্টজ এবং ফেল্ডস্পার থাকে যা বেশ শক্ত খনিজ। এ ছাড়া বালুতে এই দুই খনিজের সঙ্গে অভ্রও (Mica) পাওয়া যায় যা তুলনামূলকভাবে

নরম খনিজ। পৃথিবীর কিছু কিছু স্থানে কোয়ার্টজের সঙ্গে অন্যান্য মৌলের মিশ্রণে মূল্যবান রত্ন পাওয়া যায়। এমনকি খনিজ রূপে সোনা, রুপা, প্লাটিনাম, তামা প্রভৃতি ধাতুও খনিতে পাওয়া যায়। মূল্যবান হীরা পাওয়া যায় মৃত আগ্নেয়গিরির শিলার মধ্যে। এই হীরা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সবচেয়ে শক্ত বস্তু।

সোনার আকরিক

শিলা ও খনিজ পদার্থ সৃষ্টিতে বল এবং শক্তির ভূমিকা

শিলা ও খনিজ পদার্থ সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের বল এবং শক্তির ভূমিকা অপরিহার্য। যেমন:

আগ্নেয় শিলা: আগ্নেয় শিলা উৎপন্ন হয় গলিত লাভা ও ম্যাগমা থেকে যা ঠান্ডা ও শক্ত হয়ে শিলায় পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপশক্তি আগ্নেয়শিলা উৎপাদনের উপাদান ম্যাগমা বা লাভা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।

পাললিক শিল: পাললিক শিলা গঠনের জন্য শিলার যে খণ্ডিত অংশ বা পলল ভূমিকা রাখে তা মূলত আসে যান্ত্রিক শক্তি অর্থাৎ চাপ এবং তাপশক্তি থেকে। ক্রমাগত ঠান্ডা এবং গরম হবার ফলে অনেক কঠিন শিলা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আবার নদী বা হিমবাহের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সময় শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দানায় রূপান্তরিত হয়। শিলার এই বিচূর্ণীভবনে মূলত চাপ এবং তাপের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রূপান্তরিত শিলা: রূপান্তরিত শিলার ক্ষেত্রে চাপ অথবা তাপশক্তি অথবা উভয়েই সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে। প্রচণ্ড চাপ যদি শুধু একদিক থেকে প্রযুক্ত হয় তবে সেই রূপান্তরিত শিলা ফোলিয়েশন নামক বিশেষ স্তর প্রদর্শন করে।

বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও আকরিক

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে নানা রকম খনিজ পদার্থ দিয়ে শিলা তৈরি হয়। আকরিক বলতে সেই সকল শিলাকে বোঝায়, যার মধ্যে অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এ রকম মূল্যবান খনিজ পদার্থ থাকে এবং খুব সহজে যেগুলো থেকে মূল্যবান খনিজ সংগ্রহ করা যায়। এই সকল আকরিককে মাটির নিচে থেকে উত্তোলন করা হয়, সেখান থেকে মূল্যবান খনিজ সংগ্রহ করা হয়। জ্বালানির মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অন্তর্গত। এ ছাড়া বিভিন্ন ধাতুও আকরিক থেকে সংগ্রহ করা হয়। মাটি থেকে উত্তোলনের পর এর থেকে মূল্যবান পদার্থ আলাদা করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়েই আকরিককে গলানো হয়।

অনুশীলনী ?

১। অভ্যন্তরস্থ আগ্নেয় শিলাতে কেলাস দেখা যায় কিন্তু বহিঃস্থ আগ্নেয় শিলাতে সাধারণত কেলাস থাকে না। কারণ কী?

অধ্যায় ১৬

পৃথিবী ও মহাবিশ্ব

ছবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে জনাব
শাহজাহান মৃধা বেণুর প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির

অধ্যায় ১৫ পৃথিবী ও মহাবিশ্ব

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণার ক্রমবিবর্তন
- ☑ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি
- ☑ নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু
- ☑ অতীতের ছবি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণার ক্রমবিবর্তন

মানুষ সব সময় কৌতূহলী, তাই প্রাচীনকালে যখন মানুষ তার চারপাশে প্রকৃতি দেখত তখন তারা নিজেদের মতো একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করে নিত। তাদের কাছে মনে হতো, পৃথিবীটাই বুঝি পুরো বিশব্রহ্মাণ্ড, সেটা সমতল এবং আকাশ পৃথিবীটাকে বাটির মতো ঢেকে রেখেছে। সেই আকাশে চাঁদ, সূর্য এবং ছোট ছোট গ্রহ-নক্ষত্র লাগানো থাকে, সেগুলো সেখানে নড়াচড়া করে।

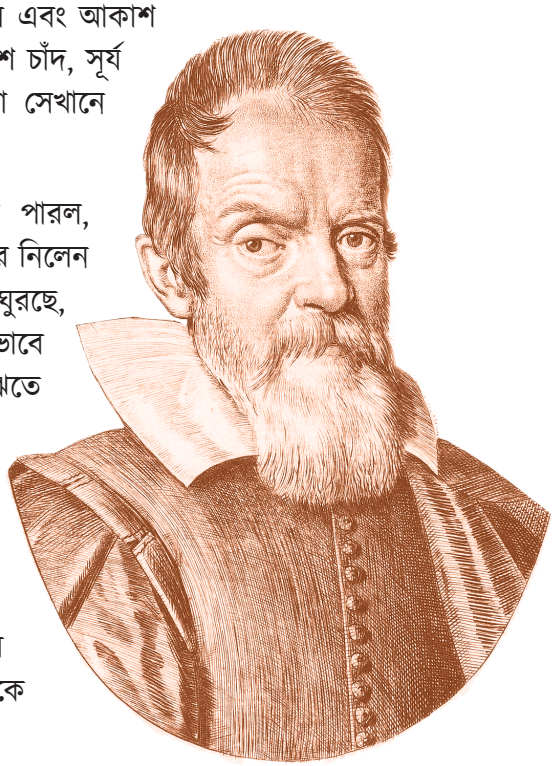

ধীরে ধীরে চিন্তাশীল বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা বুঝতে পারল, পৃথিবী সমতল নয়, এটি গোলাকার। কাজেই তারা ধরে নিলেন পৃথিবীর বাইরে গ্রহ, নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে, তারা নানা ধর্মগ্রন্থ দিয়ে তার পক্ষে যুক্তি দিলেন। এভাবে কয়েক হাজার বছর কেটে যাবার পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে আসলে পৃথিবী সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু নয়, সূর্য হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে। এই তথ্যটি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের এতই বিরুদ্ধে যে শুধু এটি বিশ্বাস করার জন্য বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গ্যালিলিওর মতো বড় বিজ্ঞানীকেও দোষী সাব্যস্ত করে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, মাত্র ১৯৯২ সালের ৩১ অক্টোবর তাকে ক্যাথলিক চার্চ শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছে!

বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে লাগলেন। নিউটনের মহাকাশের সূত্র দিয়ে গ্রহগুলোর গতিবিধি নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন সূর্য অতি সাধারণ একটি নক্ষত্র, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্যের মতো আরো অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে সেখানে অসংখ্য নক্ষত্রকে জ্বলজ্বল করতে দেখেছ। তোমরা তখন হয়তো অবাক হয়ে ভেবেছ, এই তারাগুলো কোথা থেকে এসেছে এবং এগুলো না জানি কতদূরে।

মেঘমুক্ত রাতে আকাশে যখন চাঁদ থাকে না, তখন সেই অন্ধকার আকাশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় অসংখ্য নক্ষত্রকে কুয়াশার সাদা চাদরের মতো বিস্তৃত হয়ে থাকতে দেখা যায়। এটি হচ্ছে ছায়াপথ, আমাদের গ্যালাক্সি। অসংখ্য নক্ষত্র যখন মহাকর্ষ বলে একসঙ্গে আটকে থাকে, সেটাকে বলে গ্যালাক্সি। একটা দালানের ভেতরে থাকলে যে রকম দালানটা বাইরে থেকে কেমন দেখায় সেটা বোঝা যায় না, ঠিক সে রকম আমরাও আমাদের গ্যালাক্সির ভেতরে থাকি বলে সেটা দেখতে কেমন জানি না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সেটা দেখতে কেমন সেটা অনুমান করে বের করেছেন এবং তারা এখন জানেন এই গ্যালাক্সির একশ বিলিয়ন নক্ষত্রের মধ্যে এক পাশে পড়ে থাকা একটি খুবই সাদামাটা নক্ষত্র হচ্ছে আমাদের সূর্য।

যদি আমরা শরৎকালে কিংবা শীতকালে আকাশের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি এনড্রোমিডাকে দেখতে পাব। যদি আমরা টেলিস্কোপে তাকাই, তাহলে শুধু এনড্রোমিডা নয় আরো অনেক গ্যালাক্সি দেখতে পাব। যদি অনেক ভালো টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের আরো গভীরে তাকানো যায়, আরো অনেক গ্যালাক্সি দেখা যাবে, মনে হবে গ্যালাক্সির বুঝি কোনো শেষ নেই। অনুমান করা হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই সেখানেই প্রায় এক ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে।

প্রায় ৪ বিলিয়ন বছর পরে এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির সঙ্গে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সংঘর্ষ হবে।

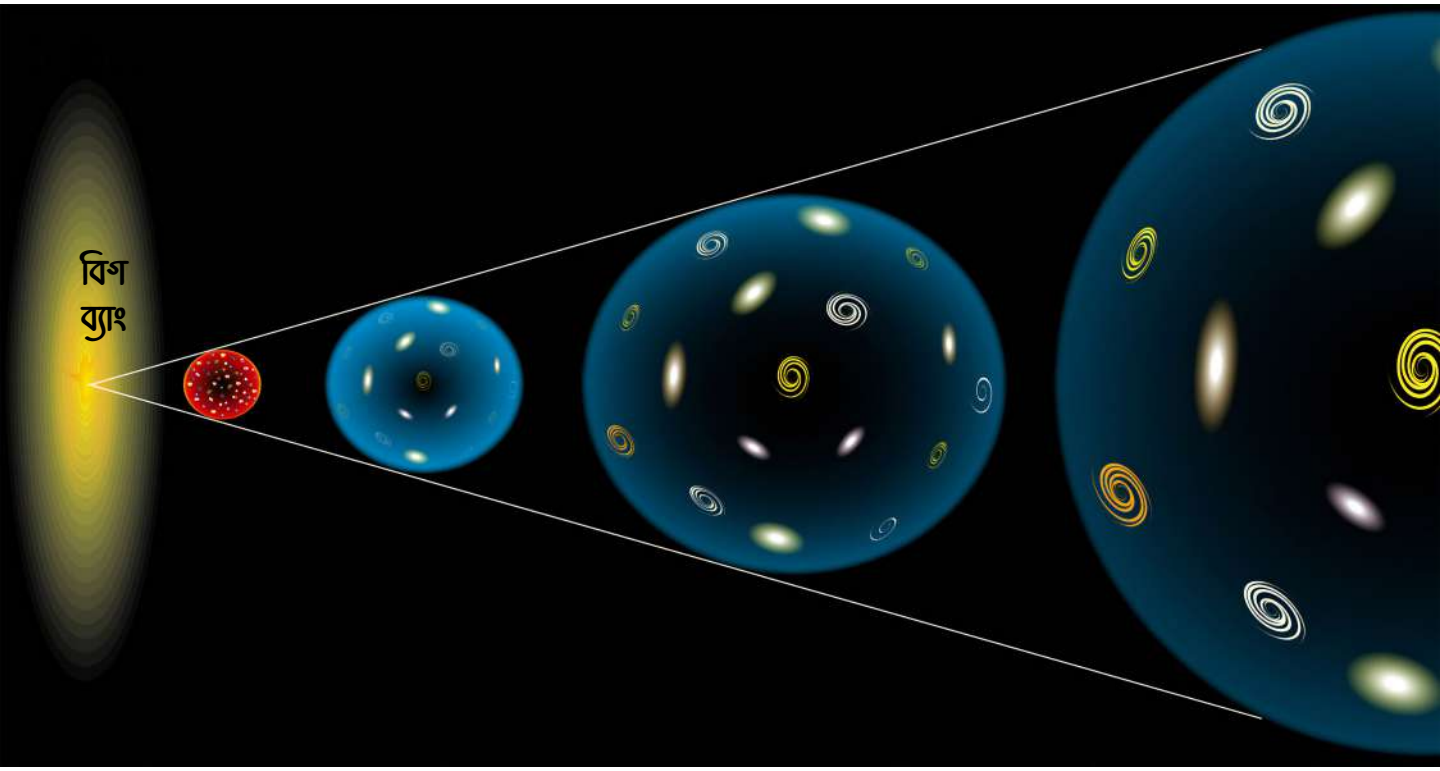

বিগ ব্যাংয়ের পর মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে শুরু করেছে।

হাবল নামে একজন বিজ্ঞানী এই গ্যালাক্সিগুলো পর্যবেক্ষণ করে সবার আগে লক্ষ করলেন, সেগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি দেখা যায়, সবগুলো গ্যালাক্সি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার অর্থ একসময় সবগুলো গ্যালাক্সি নিশ্চয়ই এক জায়গায় ছিল! হাবলের এই যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়ই একটি প্রসারণ দিয়ে শুরু হয়েছে—তারা হিসাব করে বের করলেন এই প্রসারণটি শুরু হয়েছে আজ থেকে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে। বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন বিগ ব্যাং!

> এক বছরে আলো যেটুকু দূরত্ব যায়, সেটা হচ্ছে এক *আলোকবর্ষ*, যখন অনেক বড় দূরত্ব মাপতে হয়, তখন সেটি মিটার কিলোমিটারে না মেপে আলোকবর্ষে মাপা হয়।

বলা যেতে পারে এই বিগ ব্যাং দিয়েই আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছিল। শুরুতে সেটি ছিল অচিন্তনীয় ঘনত্ব আর অবিশ্বাস্য তাপমাত্রার ক্ষুদ্র একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এবং বিগ ব্যাং দিয়ে এর প্রসারণ শুরু হয়। অনুমান করা হয় যে অংশটুকু এখন আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেটি শুরুতে ছিল একটা কমলালেবুর মতো বড়! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যতই বড় হতে লাগল, তার তাপমাত্রা ততই কমতে শুরু করল। সেই প্রসারণের কারণে আমাদের ছোট কমলার মতো সাইজের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটির আকার এখন একশ বিলিয়ন আলোকবর্ষের মতোন।

বিগ ব্যাং শুরু হওয়ার এক সেকেন্ডের ভেতর ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন তৈরি হয়ে গেলেও সেগুলো মিলে কোনো পরমাণু তৈরি হতে পারছিল না। কারণ, তাপমাত্রা এত বেশি ছিল যে, সেই তাপমাত্রায় পরমাণুগুলো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাপমাত্রা কমার জন্য অপেক্ষা করতে হলো।

যতই সময় পার হলো, ততই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হতে লাগল এবং এর তাপমাত্রা কমতে লাগল। ৩৮০,০০০ বছর পর তাপমাত্রা যখন যথেষ্ট কমেছে, তখন পরমাণুগুলো তৈরি হতে শুরু করল। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ সবার প্রথমে তৈরি হয়েছিল সবচেয়ে সহজ পরমাণু—যেটি হচ্ছে হাইড্রোজেন!

কিন্তু পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার কারণ, তখন পর্যন্ত কোনো নক্ষত্রের জন্ম হয়নি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করার জন্য কোনো নক্ষত্র 'জ্বলে' উঠেনি।

নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু

নক্ষত্র জীবিত প্রাণী নয়, তার পরেও আমরা কিন্তু নক্ষত্রের জন্য জন্ম এবং মৃত্যু এই দুইটি শব্দই ব্যবহার করি, কারণ, সত্যি সত্যি নক্ষত্রের জন্ম হয়, তার একটি খুবই ঘটনাবহুল জীবন থাকে, তারপরে এক সময় নক্ষত্রের মৃত্যু হয়।

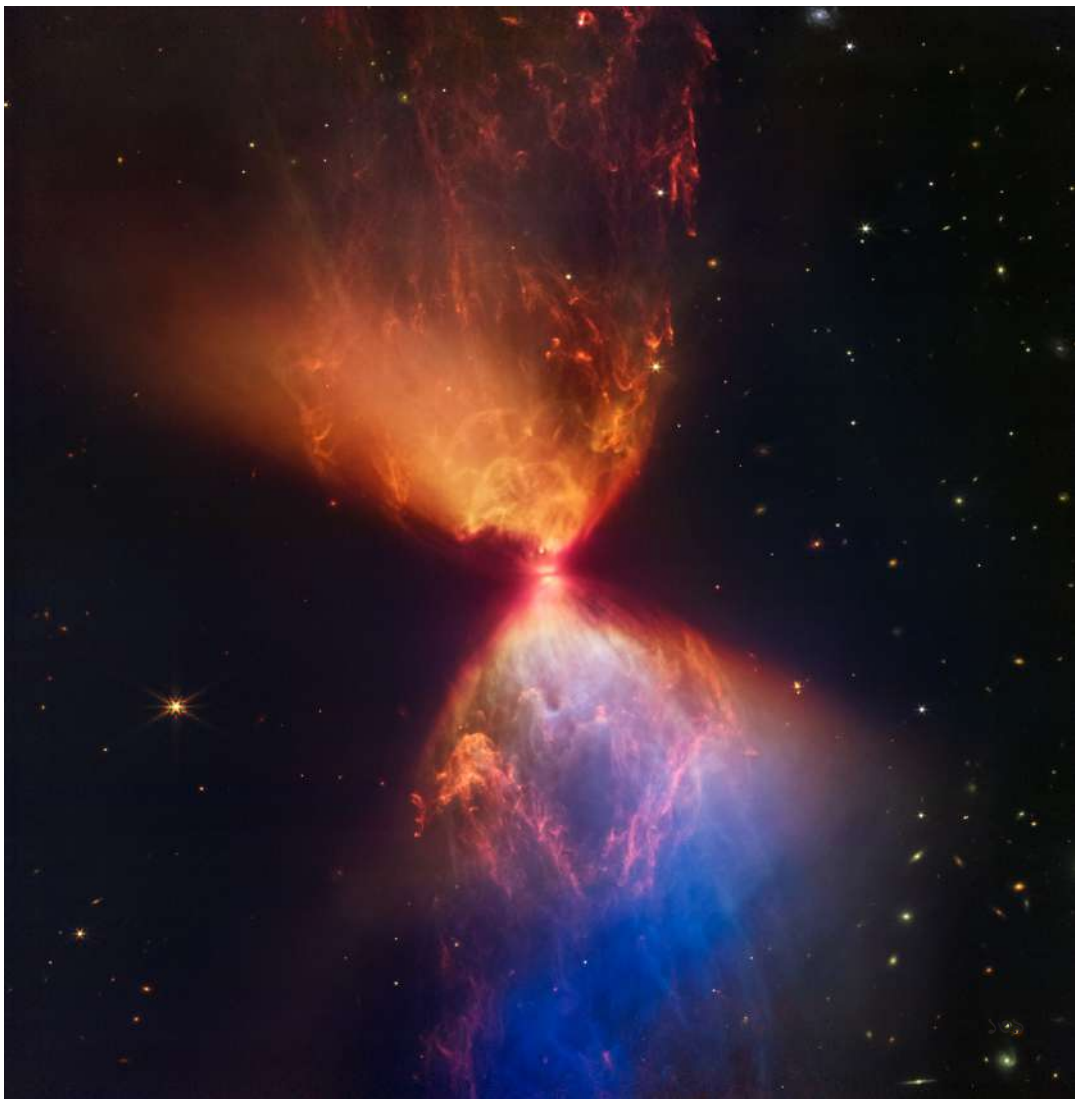

পাশের ছবিতে একটা নক্ষত্রের জন্মদৃশ্য, খুব সম্প্রতি নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে এই দৃশ্য। ছবিটার ঠিক মাঝখানে ভরগুলো কেন্দ্রীভূত হয়ে নক্ষত্রের রূপ নিচ্ছে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রথমে ছিল শুধু হাইড্রোজেন। এই হাইড্রোজেন কোথাও কোথাও মহাকর্ষ বলের কারণে একত্রিত হয়ে একটা গ্যাস-পিণ্ডের আকার নেয়। সেই গ্যাস-পিণ্ডের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে মহাকর্ষ বলের কারণে সেগুলো সংকুচিত হতে থাকে এবং যতই সংকুচিত হয়, তার তাপমাত্রা ততই বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একসময় এতই বেড়ে যায় যে তখন ভেতরের হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস একটি অন্যটার সঙ্গে একত্রিত হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটাকে বলে নিউক্লিয়ার ফিউশান, এবং তখন সেখান থেকে বিশাল পরিমাণ শক্তি বের হয়, নক্ষত্রটি তাপ আর আলো দিতে শুরু করে—আমরা বলি নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে! পাঁচ বিলিয়ন (পাঁচশ কোটি) বছর আগে আমদের সূর্য ঠিক এইভাবে জন্ম নিয়েছিল। আরও পাঁচ বিলিয়ন বছর সূর্য এইভাবে আলো দেবে, তারপর একসময় যখন তার হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে, তখন সেটি নিষ্প্রভ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বেশিরভাগ নক্ষত্রের জীবন এরকম। সেগুলোর জন্ম হয়, একটা দীর্ঘ জীবন আলো দেয় তারপর মৃত্যুবরণ করে।

নক্ষত্রের জীবন খুবই বিচিত্র, যে নক্ষত্রের ভর যত বেশি, তার আয়ু তত কম এবং সেটি তত দ্রুত তার জ্বালানি শেষ করে ফেলে। যদি নক্ষত্র অনেক বড় হয়, তাহলে তার জ্বালানি শেষ করার সময় তার ভেতরে অনেক ধরনের মৌল তৈরি করে একসময় অবিশ্বাস্য একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার জীবন শেষ করে দেয়। সেই বিস্ফোরণকে বলে সুপারনোভা বিস্ফোরণ এবং সুপারনোভা বিস্ফোরণের আলোতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে যায়!

সুপারনোভা বিস্ফোরণে নক্ষত্রের বাইরের অংশটুকু ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যায়। কিন্তু ভিতরের অংশটুকু মহাকর্ষ বলের প্রচণ্ড আকর্ষণে সংকুচিত হতে হতে কখনো কখনো ব্ল্যাকহোলে রূপান্তরিত হয়। ব্ল্যাকহোলের প্রবল আকর্ষণে সেখান থেকে আলো পর্যন্ত বের হতে পারে না বলে তার নাম 'ব্ল্যাকহোল'।

ব্ল্যাকহোলের রহস্য আরও চমকপ্রদ। তোমরা যখন আরও বড় হবে তখন সেটি সম্পর্কে আরও জানবে।

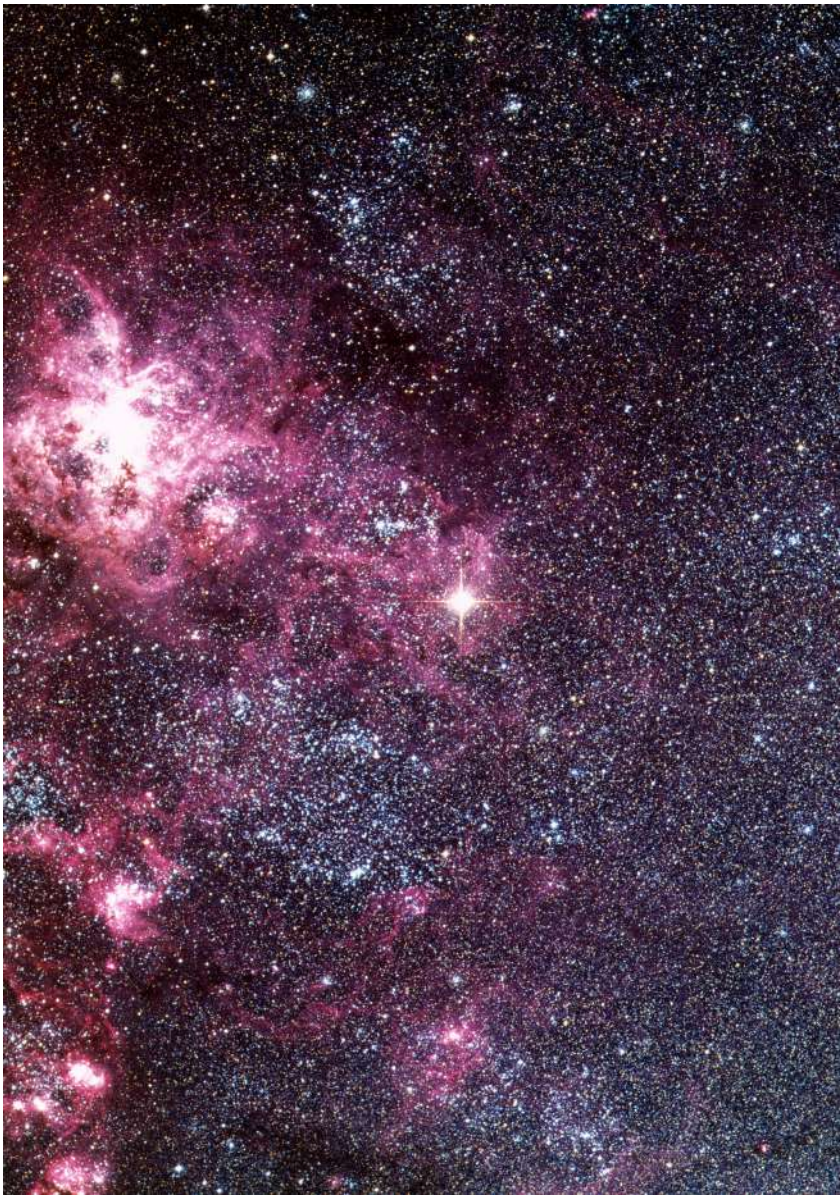

ছবির মাঝখানের উজ্জ্বল তারাটি হল সুপারনোভা 1987A, বিস্ফোরণটি খালি চোখে দৃশ্যমান ছিল।

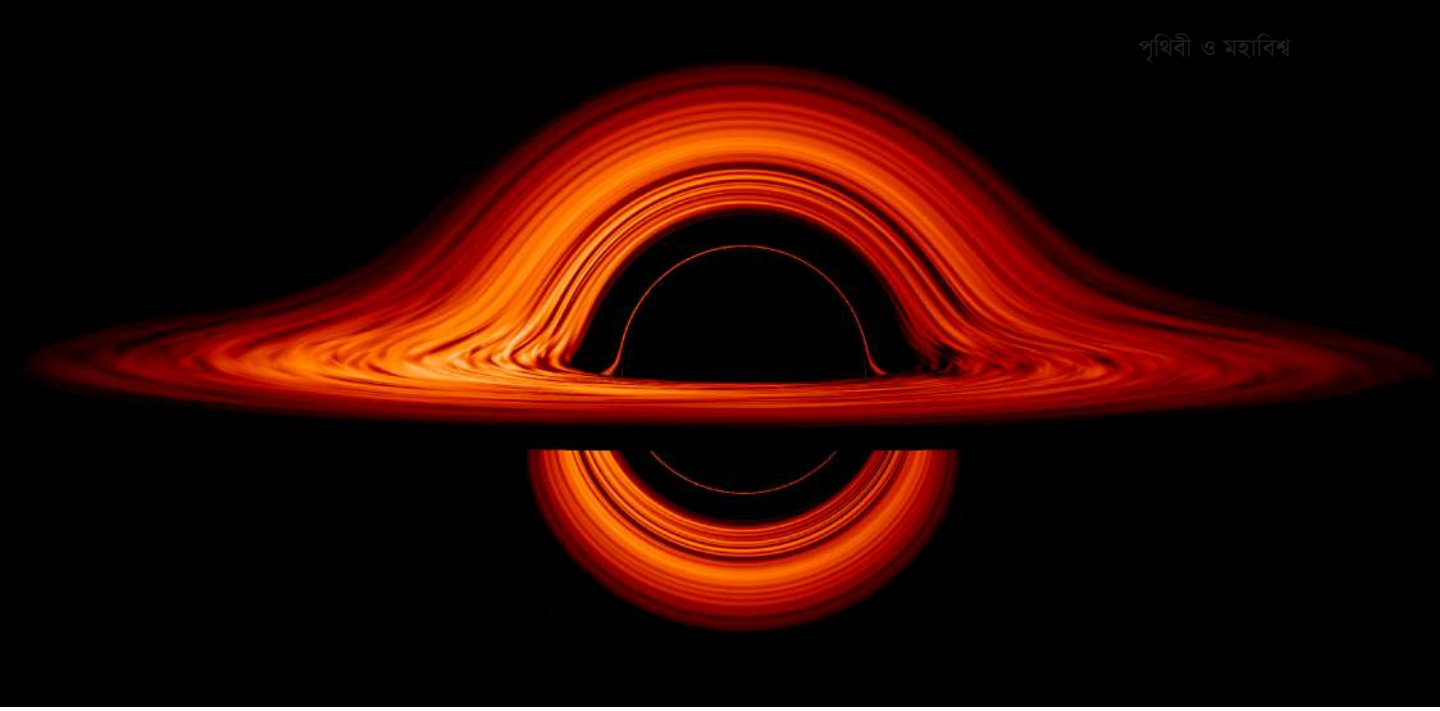

নাসা'র কাল্পনিক চিত্রায়নে ব্লাকহোলের রূপ।

একটা বিষয় মনে রেখ, আমরা কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুধু খানিকটা দেখতে পাই, যেটাকে বলা হয় দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—তার বাইরের অংশটুকু দেখতে পাই না এবং কখনোই দেখতে পাব না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি প্রসারিত না হতো, তাহলে আগে হোক পরে হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোনো প্রান্ত থেকে আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছাত। কিন্তু যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে, তাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে থাকলে সেখানকার আলো আর আমাদের কাছে কখনো পৌঁছাতে পারবে না—সেটা আমাদের ধরা-ছোঁয়া এবং জানার বাইরে থেকে যাবে। সেই নির্দিষ্ট দূরত্বকে আমরা বলি দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এর আকার হচ্ছে একশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

অতীতের ছবি

একটু আগেই তোমাদের বলা হয়েছে যে আলোকবর্ষ দিয়ে দূরত্ব মাপা হয়। আলোর একটা নির্দিষ্ট বেগ রয়েছে, তাই দূরত্ব অতিক্রম করতে সেটা সময় নেয়। আমরা যখন সূর্যের দিকে তাকাই, আমরা কিন্তু এই মুহূর্তের সূর্যকে দেখি না, আট মিনিট আগের সূর্যকে দেখি। কারণ সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে আট মিনিট সময় লাগে। কোনো একটা বিচিত্র কারণে হঠাৎ করে যদি সূর্যটা অদৃশ্য হয়ে যায় আমরা কিন্তু সেটা জানতে পারব, আট মিনিট পরে। ঠিক সেরকম আমরা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা নক্ষত্রকে মিটমিট করে জ্বলতে দেখি সেটি কিন্তু এই মুহূর্তের নক্ষত্র নয়। সেটা কত দূরে আছে তার উপর নির্ভর করবে কত শত কিংবা কত হাজার বছর আগের নক্ষত্রটিকে দেখছি! যেমন কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী যখন দেখি আমরা তখন ১,৩০০ বছর আগের নক্ষত্রটিকে দেখি। আবার আমাদের সবচেয়ে কাছের এনড্রোমিডা গ্যালাক্সিটি যখন আমরা দেখি, তখন কিন্তু আমরা এই মুহূর্তের এনড্রোমিডা দেখছি না। ২৫ লক্ষ বছর আগে এনড্রোমিডা কেমন ছিল সেটা দেখছি।

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে তোলা ছবিতে ১৩ বিলিয়ন বছর অতীতের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছে।

কাজেই পরের বার যখন আকাশের দিকে তাকাবে, তখন একবার মনে করো তুমি কিন্তু হাজার কিংবা লক্ষ বছর অতীতে তাকিয়ে আছ।

অনুশীলনী ?

১। চার বিলিয়ন বছর পর অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি এবং আমাদের গ্যালাক্সির মাঝে সংঘর্ষ হবে। সেই সংঘর্ষের সময় একটা গ্যালাক্সি অন্য গ্যালাক্সির ভিতর দিয়ে চলে যাবে নাকি দুটি গ্যালাক্সি দুটি পাথরের টুকরোর মতো ধাক্কা খাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' যার ভিশন হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ' এ প্রথম ঘোষণা করা হয় যে ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' অর্জন করেন। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কৃতিত্বের জন্য ২০১৬ সালে 'উন্নয়নে আইসিটি পুরস্কার' অর্জন করেন ।
- বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৭৫ কি. মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২ হাজার ৪টি ইউনিয়নে ওয়াইফাই রাউটার (Wifi Router) স্থাপন এবং ১ হাজার ৪৮৩টি ইউনিয়নকে নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আইটি সেক্টরে বহুমানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সঙ্গে পরিচিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ
সপ্তম শ্রেণি বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য